শব্দ হইল। সকলে গিয়া দেখে ভুবনের ঘরে দ্বার বন্ধ। ডাকাডাকি করিয়া উত্তর পাইল না, শেষে দরজা ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখে ভুবন গুলি খাইয়া মরিয়াছে, আপনা আপনি মুখের মধ্যে বন্দুক ছুড়িয়া মরিয়াছে! তার পর যে বাড়ীতে কি কান্নার রোল, তা আমরা বর্ণনা করিতে পারিব না, তোমরা বুঝিয়া লও। সে ব্যাপার বুঝিলেই ভাল জানা যায়।

সকলেরই দুঃখে হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু কেশবের সৎকথায় ও সান্ত্বনাতে বাবুর মন অনেকটা ভাল ছিল। কিন্তু কদিন থাকে? যখনই শুনিলেন যে ভুবনের মা পাগল হইয়া কোথায় গিয়াছেন, ও তাহার স্ত্রী হাতে পায়ে কাপড় বাঁধিয়া খিড়কীর পুকুরে ডুবিয়া মরিয়াছেন, তখন আর তাঁহার সহ্য হইল না। বৌটীকে তিনি "মা" বলিয়া ডাকিতেন ও বড়ই ভাল বাসিতেন। এ বড় অসহ্য যন্ত্রণা হইল। মাটিতে পড়িয়া "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গড়াইতে লাগিলেন। আহা! কাপড় জামা ধূলায় লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল, মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া শেষে অচেতন হইয়া পড়িলেন। সকলে মুখে চক্ষে জল দিয়া সুস্থ করিল।

বাবু এই অবধি কেশব ভিন্ন আর কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। আর বেশী দিন বাঁচেন নাই। কেশব তাঁহাকে ইংরাজী বাঙ্গলা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া শুনাইত। ক্রমে তাঁহার বেশ ধর্ম্মজ্ঞান হইল। তিনি অল্প দিন পরে কেশবের হস্তে আপনার বিধবা স্ত্রী ও সমস্ত বিষয়, জমিদারী, টাকা ও বাণিজ্যের ভার দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এখনও কি পাঠক পাঠিকা বলিবেন "লেখা পড়া শেখা কেবল চাকরী করিবার জন্য"—?

রামতনু লাহিড়ী।



বালিকাগণ যে মহাত্মার ছবি আজ তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি ইহাঁর নাম কি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলে? যদি না শুনিয়া থাক তবে শুন, ইহাঁর বিষয় কিছু বলি। ইনি একজন আমাদের দেশের বিখ্যাত ব্যক্তি। কিসের জন্য বিখ্যাত? অতুল বিভব সঞ্চয় করিয়া মতিলাল শীল যেরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন সেইরূপ বিখ্যাত নয়; বুদ্ধি বিদ্যার জন্য মৃত দ্বারিকানাথ মিত্র যেরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন সেরূপ নয়, দান ও বিবিধ সৎকীর্ত্তির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ বিখ্যাত হইয়াছেন সেরূপ নয়; ইনি ধনীদের মধ্যে একজন নন; যদিও আজীবন সকল প্রকার সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা, তথাপি সে বিষয়েও অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া ইহাঁর নাম নয়; তবে কেন লোকে ইহাঁর প্রশংসা করে, আর কেনই

বা ইহাঁর জীবন বৃত্তান্ত তোমাদিগকে বলিতে চাহিতেছি? ইনি সাধুতার জন্য দেশে বিখ্যাত। ইনি একখানিও গ্রন্থ লেখেন নাই, সকল কাজেই অন্যের পশ্চাতে থাকিয়া কাজ করিয়াছেন, আপনাকে সকলের অপেক্ষা হীন মনে ভাবিয়া লুকাইয়া থাকিতে ভাল বাসিয়াছেন, কিন্তু তথাপি মৃগনাভি যেমন কাপড় ঢাকা থাকিলেও আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, গোলাপ যেমন বনে লুকাইয়া থাকিলেও আপনাকে ধরা দেয়, সেইরূপ এই মহাত্মার সাধুতার সুবাস আপনা আপনি ইহাঁকে জানাইয়া দিয়াছে। যদিও ইনি এখন জীবিত আছেন এবং এখন এই কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন, তথাপি নিজ চরিত্রের গুণে ইনি প্রাচীন কালের সাধুদের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হইয়াছেন; আমরা সকলে ইহাঁকে পিতৃতুল্য জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করি। এরূপ সাধু মহাত্মাকে জীবনে একবার দেখিতে পাওয়াও সৌভাগ্য।

অগ্রে ইহাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলি। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে ইহার জন্ম হয়; সুতরাং ইহাঁর বয়ঃক্রম এখন ৭১ বৎসর। বাল্যকালে ইনি পাঠশালায় লেখা পড়া অভ্যাস করেন। কিন্তু তখনকার বালকদিগের স্বভাব চরিত্র বড় মন্দ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাহারা অনেক কু-অভ্যাস শিক্ষা করিত। এই সকল কু সংসর্গে পড়িয়া তাহার পড়া শুনা ভাল হইতেছে না দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই এদেশের লোককে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য স্কুলসোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপন হয়। রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোক এই সভার সভ্য ছিলেন। ডেভিড হেয়ার এই সভার সম্পাদক ছিলেন। রামতনু বাবুর কলিকাতা আসিবার কিছু পূর্ব্বে মহাত্মা হেয়ার সাহেবের যত্নে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ তাহাকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে তিনি হিন্দু কলেজে গমন করেন। হিন্দু কলেজে তখন ডিরোজিও নামে একজন ফিরিঙ্গী যুবক চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁর নাম বাঙ্গালা দেশের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তির জানা উচিত, কারণ যে সকল শিক্ষিত লোকের যত্নে প্রথম প্রথম সকল প্রকার উন্নতির স্রোত এদেশে প্রবাহিত হয় সেই সকল লোক এই ডিরোজিও সাহেবেরই শিষ্য ছিলেন। এই অসাধারণ বুদ্ধিশালী যুবকের বয়স তখন ২০ বৎসরের অধিক ছিল না কিন্তু তিনি সুবিদ্বান, সুলেখক, সুকবি ও সুভাষী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন, মুখ হাসি হাসি, ও প্রকৃতি বড় মেশক ছিল। তিনি যে কেবল বালকগণকে পড়িবার বই পড়াইয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা নহে, কিন্তু অন্যান্য সময়েও তাহাদিগের মধ্যে বসিয়া গল্পচ্ছলে ও নানা প্রকার বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন। যাহাতে তাহাদের কু-সংস্কার দূর হয়, সত্যের প্রতি ভালবাসা জন্মে, চিত্ত উদার হয়, চিন্তা করিবার শক্তি জন্মে, প্রাণে ভাল ইচ্ছা প্রবল হয়, সর্ব্বদা এইরূপ আলাপ করিতেন। তাঁহার ভালবাসা ও সদুপদেশের গুণে ক্রমে অনেকগুলি ছাত্র তাঁহার শিষ্য হইল। তিনি ইহাঁদের সঙ্গে প্রতিদিন অনেকক্ষণ থাকিতেন। ইহাঁরা এদেশের ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাসে "ডিরোজিও ক্লব" নামে বিখ্যাত। যাঁহারা তখন ডিরোজিও সাহেবের শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তৎপরে এদেশে বড়লোক হইয়াছেন। মৃত রামগোপাল ঘোষ, যিনি

এদেশে একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া বিখ্যাত, তিনি এই ক্লবের একজন সভ্য ছিলেন, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক যাঁহার নাম সকলে জানেন না কিন্তু যিনি সে সময়কার একজন বড় লোক ছিলেন, তিনিও ডিরোজিওর শিষ্য। এই রূপে ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মৃত হরচন্দ্র ঘোষ, মৃত রাজা দিগম্বর মিত্র, মৃত রাধানাথ সিকদার, শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি পরে জনসমাজে এত যশ লাভ করিয়াছেন তাহারা সকলে ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন। ডিরোজিও তাহার সুমিষ্ট বাক্যের দ্বারা বালকগণের মন এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে ছেলেরা তাহার জন্য মরিতে পারিত। তিনি বালকদিগকে সত্য-প্রিয়, উদার, সাহসী ও তেজস্বী করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

তাহারা দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুসমাজের কুসংস্কার-বিরুদ্ধ অনেক আচরণ আরম্ভ করিল। তখন কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দু-সমাজের দলপতিগণ দলবদ্ধ হইয়া ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার প্রতি এই দোষারোপ করা হইল যে তিনি বালকদিগকে নষ্ট করিতেছেন। এই কারণে ডিরোজিও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার ক্লব তাহার বাসবাটী ইটালীতে উঠিয়া গেল। তাঁহার এত টান ছিল, যে ছেলেরা রৌদ্র, বৃষ্টি, জল, ঝড়ে কষ্ট পাইয়াও এবং বাড়ীর লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও তাঁহার বাড়ীতে যাইত। অতি অল্প বয়সেই ইহাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে তিনি বাঙ্গালি ছাত্রদিগকে যে শিক্ষা দিয়া যান, সেই শিক্ষার সুফল অদ্যাপি দেখা যাইতেছে।

সে যাহা হউক রামতনু বাবু হিন্দু কলেজে গিয়া এই সকল বন্ধুর মধ্যে পড়িলেন। তিনি বিনয়ী, তিনি বন্ধুদিগের পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিতে চিরদিন ভাল বাসেন। তিনি বন্ধুদিগের পশ্চাতেই থাকিয়া চিরদিন কাজ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের গুণে ও সাধুতার গুণে তাঁহার সকল বন্ধুই তাঁহাকে গুরুতুল্য শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন।

১৮৩৪ সালে ইনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে একটী কর্ম্ম পাইলেন। এইখানে তিনি দশবৎসর কর্ম্ম করেন। পরে ১৮৪৫ সালে কৃষ্ণনগর কলেজ খুলিলে সেখানকার একটী শিক্ষকের পদ পাইয়া সেখানে যান। হেয়ার স্কুলে ইনি একজন সামান্য শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তথাপি ইহাঁর চরিত্রের গুণে ইনি সকলের এতদূর প্রিয় ছিলেন, যে যখন ইনি হেয়ার স্কুল ছাড়িয়া যান তখন ইহাঁর বন্ধু বান্ধব একত্র হইয়া ইহাঁকে সম্মান করিবার জন্য এক সভা করেন, ঐ সভাতে তাঁহাকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ একটী সোণার ঘড়ি দেওয়া হয়।

কৃষ্ণনগর হইতে ইনি বর্দ্ধমান স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান। সেখান হইতে উত্তরপাড়া স্কুলে, তৎপরে বসাপাগলা স্কুলে, তৎপরে বরিশাল স্কুলে বদলী হন। সর্ব্বশেষে ১৮৬০ সালে আবার কৃষ্ণনগর কলেজে বদলী হইয়া আসেন। সেখানে থাকিতে থাকিতে ১৮৬৫সালে পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর প্রতি কৃষ্ণনগরের লোকের এত ভালবাসা যে ১৮৫৪ কি ১৮৫৫ সালে তাঁহারা ইহাঁর এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখনও কৃষ্ণনগরে আছে। পেন্সন্ লওয়ার পর অবধি ইহাঁর শরীরের অবস্থা বড় মন্দ। একে বৃদ্ধাবস্থা তাহাতে শরীর খারাপ; ইনি আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত নানা কাজে যোগ দিতে পারেন না। সর্ব্বদাই বাড়ীতে থাকিতে

হয়। এইরূপে ইহাঁর জীবনের শেষ দিন কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু যদিও বয়সে ইনি প্রাচীন তথাপি উৎসাহে যুবা। এখনও ইহাঁর নিকট বসিলে কত সদুপদেশ পাওয়া যায়। ইহাঁর পবিত্র মূর্ত্তি দেখিলেই অসাধু মন সাধু হইয়া যায়। নিকটে দুই দণ্ড বস, কেবল ধর্ম্মের কথা, সাধুতার কথা শুনিবে। যেরূপ মনটী লইয়া যাইবে সেরূপ মনটী লইয়া আসিতে পারিবে না; মলিন মন ভাল হইয়া যাইবে। আমাদের দেশের একজন কবি এই মহাত্মার বিষয়ে বলিয়াছেন;—

"যাঁর সঙ্গে একদিন করিলে যাপন,
সাত দিন থাকে ভাল পাপাসক্ত মন।"

ইহা অতি সত্য কথা। ইহাঁর সঙ্গে আধ ঘণ্টা থাকিলেই অপবিত্র মন পবিত্র হইয়া যায়।

আমরা ইহাঁর অনেকগুলি সদ্‌গুণ দেখিয়াছি। প্রথম সদ্‌গুণ বিনয়। এমন বিনীত লোক প্রায় দেখা যায় না। ইনি মনে করেন যেন ইনি সকলের অধম। যদি কখনও কোন ব্যক্তির কোন দোষ বলিতে হয় তখন ইহাঁর বড়ই ক্লেশ হয়। বলেন "আমি নিজে কত দোষে দোষী আমার অপরের দোষ দেখান ভাল হয় না কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সত্য রক্ষার জন্য বলিতেছি" এইরূপ করিয়া অনেক কষ্টে অপরের একটী দোষের কথা বলেন। সর্ব্বসাধারণে যে সকল লোককে ঘৃণা করে তাহাদের যদি একটি গুণ দেখিতে পান ইনি সেই গুণের কত প্রশংসা করেন। এমন কি আমরা দেখিয়াছি যে ইহাঁর পৌত্রের বয়সী লোকের নিকটেও বিনয়ের সহিত কথা কহিতেছেন, যেন সে তাঁহাকে কত শিখাইতে পারে।

ইহাঁর দ্বিতীয় গুণ সরলতা ও সত্যপ্রিয়তা। এমন সত্যপ্রিয় সরল লোক আমরা আর দেখি নাই। কপটতাকে ইনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। হিন্দুকলেজে পড়িবার সময় অবধি ইহাঁর জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। কিন্তু তার পর কয়েক বৎসর লোকের ও গুরুজনের অনুরোধে জাতি ও পৌত্তলিকতা রাখিয়া চলিতেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে, বোধ হয় বর্দ্ধমানে কর্ম্ম করিবার সময় একদিন পৌত্তলিক ক্রিয়া অনুসারে কোন মৃত আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, তখন একটী বালক দাঁড়াইয়া উপহাস করিয়া অপরের নিকট বলিতেছিল—"বাবুর এদিকেত বলা হয় আমি জাত মানি না, ঠাকুর মানি না কিন্তু এদিকে আবার শ্রাদ্ধটাও করা আছে।" এই কথাগুলি রামতনু বাবুর প্রাণে বাণের ন্যায় বিঁধিল। তিনি সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অকপট ভাবে নিজ বিশ্বাসের মত কাজ করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া জাতির চিহ্ন পৈতা পরিত্যাগ করিলেন। দেশে ভয়ানক হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সমুদায় সহ্য করিলেন। সেই অবধি ইনি সকল বিষয়েই সরল ও অকপট। লোকে রুষ্টই হউক আর তুষ্টই হউক যাহা সত্য বলিয়া জানেন ও বিশ্বাস করেন সেইরূপ বলিবেন ও করিবেন।

তৃতীয়তঃ—ইহাঁর ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্য্য, এমন আর দেখা যায় না। পাছে কোন কাজে কোন প্রকারে অন্যায় হয় এই ভয়ে সর্ব্বদাই জড় সড়। অধর্ম্মকে ইনি বড় ভয় করেন। সর্ব্বদাই বলেন—"ছেলে যদি মূর্খ হইয়া সৎ থাকে তাহা ভাল, কিন্তু শিক্ষা পাইয়া যদি অসৎ হয় সে শিক্ষা চাই না।"

চতুর্থতঃ—ঈশ্বরের প্রতি ইহাঁর প্রগাঢ় ভক্তি।

বড় বড় বিপদের সময় ইনি যে ভাবে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সুস্থির থাকিয়াছেন তাহা দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন শুনিলে ইনি চক্ষের জল রাখিতে পারেন না।

এই সাধু পুরুষের বিষয়ে অনেকগুলি ভাল ভাল গল্প আছে, তাহা আর একবারে দেওয়া যাইবে।



বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

সেলাই।

নং ২।

ঠিকাগণ! সেবারে তোমাদের গলাবন্ধ বুনিবার বিষয় বলিয়াছিলাম, এবার ছোট মোজা বুনিবার বিষয় কিছু বলিব মনে করিতেছি। আশা করি আমি যাহা বলিব তোমরা তাহা একটু মন দিয়া শুনিতে চেষ্টা করিবে। ছোট মোজার যে ছবি এবার দেওয়া গেল এই ছবি দেখিয়া তোমাদের কেমন বোধ হইবে তাহা জানি না, কিন্তু আমি যখন ইহা প্রথম দেখিয়াছিলাম তখনই আমার এই রকম এক জোড়া মোজা বুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।

ছোট ছেলেদের মোজা যত ফিকে রং দিয়া বুনা যায় ততই ভাল দেখায়, এজন্য আমরা ইহা সাদাতে ফিকে নীলেতে, সাদাতে ফিকে গোলাপীতে বা সাদাতে ফিকে লালেতে বুনিয়া থাকি। কখন কখন সাদাতে ঘোর গোলাপীতে, সাদাতে ঘোর নীলেতে কিম্বা সাদাতে ঘোর লালেতে ও সে না বুনি তাহা নয়, কিন্তু আমার বোধ হয় ফিকে রং দিয়া বুনিলেই কচি কচি ছেলেদের বেশী মানায়। মনে কর যে মোজাটির ছবি দেখিতেছ তাহা যেন সাদাতে আর ফিকে লালেতে বুনা হইয়াছে। আচ্ছা এখন বল দেখি ইহার কোন খানটায় লাল আর কোন খানটায় সাদা? যদি তোমাদের একটু বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারিবে, কিন্তু আমার যখন তোমাদিগকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য নয় তখন আর তোমরা বলিতে পার কি না তাহা জানিবার জন্য অপেক্ষা করিলে চলিবে না, এজন্য আমি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই তোমাদিগকে বলিতেছি।

এই মোজা বুনিতে খানিকটা ফিকে লাল এবং খানিকটা সাদা পশম চেরা এবং পাঁচটা মোজা বুনিবার হাড়ের কাঁটা দরকার। প্রথমে লাল পশম দিয়া ১৬ টা ঘর তোল, এই ঘর গুলি সমান ৪ ভাগে ভাল করিয়া আরও ৩ টা কাঁটায় তুলিয়া লও তাহা হইলেই এক এক কাঁটায় ২৪টা করিয়া ঘর হইবে। ৪ কাঁটা দিয়া বড় মোজা যেরূপে বুনে এই মোজা ও সেই রূপে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হয় কিন্তু ইহাতে পাঁচটা কাঁটার দরকার কারণ ইহার ৪টা কাঁটায় ঘর লইতে হয় এবং ১টা কাঁটা দিয়া বুনিতে হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

৩বার—সাদা পশম দিয়া সোজা।



৪বার - সাদা পশম দিযা *৪টা সোজা পশম সম্মুখে আনিযা ১টাসোজা, ৩টা সোজা, ৩টা একসঙ্গে সোজা। আবাব * চিহ্নিত স্থান হইতে আবম্ভ কব।

৫বার—সাদা পশম দিযা সমস্ত সোজা, ৪ বাবে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইযাছে এবাবেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে।

৬বার—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা; কেবল ৫বাবে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছিল এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা।

৭বার—সাদা পশম দিয়া সমস্ত সোজা; কেবল ৬বারে যেখানে যেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছে এবারেও সেখানে সেখানে ৩টা এক সঙ্গে সোজা।

৮বার—সাদা পশম দিযা সমস্ত সোজা। এখন একবাব গুনিযা দেখা আবশ্যক কতগুলি ঘর আছে, কাবণ যদি ৪৮টা ঘব থাকে তাহা হইলে ঠিক হইযাছে নতুবা ভুল।

৯বাব—লাল পশম দিযা সোজা।

১০বাব—লাল পশম দিযা উল্টা।

১১বার—লাল পশম দিযা উল্টা।

১২বাব—সাদা পশম দিয়া সোজা।

১৩ হইতে ৩০বার—সাদা পশম দিয়া ১টা ঘর উল্টা, ১টা ঘর সোজা।

৩১বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

৩২ হইতে ৩৩বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

৩৪বার—সাদা পশম দিয়া সোজা।

৩৫বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত পশম সম্মুখে আনিয়া ২টা ঘর এক সঙ্গে সোজা।

৩৬বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

৩৭ হইতে ৩৮বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

৩৯ হইতে ৪৭বার—লাল পশম দিয়া একবার ১টা উল্টা আর ১টা উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে, আবার তাহার পরের বারে পূর্ব্বে যেখানে উল্টা সেখানে উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে আর যেখানে উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে সেখানে উল্টা।

এখন পায়ের পাতার জন্য ১৮টা ঘর একটা কাঁটাতে উঠাইয়া লও এবং বাকি ৩০টা ঘর দুই ভাগ করিয়া দুইটা কাঁটায় তুলিয়া রাখ।

এতক্ষণ যেরূপ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিতে হইয়াছে পায়ের পাতার জন্য সেরূপে বুনিতে হইবে না, এখন দুইটা কাঁটা দিয়া বুনিতে হইবে।

৪৮বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

৪৯বার—লাল পশম দিয়া উল্টা।

৫০বার—লাল পশম দিয়া সোজা।

৫১বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত ১টা সোজা আর ১টা উল্টা।

৫৩ বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত একটা উপর দিক দিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে আর উল্টা বুনিতে হইবে।

৫৪ বার—সাদা পশম দিয়া ক্রমাগত ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা।

সাদা পশম দিয়া ৮২ বার পর্য্যন্ত, ৫১ বার হইতে ৫৪ বার পর্য্যন্ত যেরূপে বুনা হইয়াছে ঠিক সেইরূপে বুনিতে হইবে।

৮৩ বার—সাদা পশম দিয়া ৫১ বারের মত।

৮৪ বার—২ টা এক সঙ্গে উল্টা, ১ টা সোজা, ১টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ১টা সোজা, ১টা উল্টা, ২টা এক সঙ্গে সোজা।

৮৫ বার—সাদা পশম দিয়া ২ টা এক সঙ্গে উল্টা, ১ টা সোজা, ১টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২ টা এক সঙ্গে সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ২ টা এক সঙ্গে সোজা।

৮৬ বার হইতে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত লাল পশম দিয়া।

৮৬ বার—সোজা।

৮৭ বার—১ টা সোজা, ২ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা উল্টা, ১টা সোজা, ২টা উল্টা, ১টা সোজা।

৮৮ বার—২ টা একসঙ্গে সোজা, ১ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ২ টা একসঙ্গে সোজা, ১ টা উল্টা, ২টা সোজা, ১ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২টা এক সঙ্গে সোজা।

৮৯ বার—২টা এক সঙ্গে উল্টা, ১টা সোজা, ২ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২ টা উল্টা, ১ টা সোজা, ২ টা একসঙ্গে উল্টা।

৯০ বার—২টা একসঙ্গে উল্টা, ২ টা সোজা, ১ টা উল্টা, ২ টা সোজা, ২ টা একসঙ্গে উল্টা।

৯১ বার—২ টা একসঙ্গে সোজা, ৩ টা সোজা, ২ টা একসঙ্গে সোজা।

৯২ বার—২ টা একসঙ্গে সোজা, ১ টা সোজা, ২ টা একসঙ্গে সোজা।

৯৩ বার—৩ টা একসঙ্গে সোজা।

৯৪ বার—যে ঘরটা আছে তাহার মুখ বন্ধ করিতে হইবে।

এখন পাষের পাতার দুই ধারের ঘরগুলি বেশ করিয়া দুইটা কাঁটায় তুলিয়া লও। পূর্ব্বের যে ৩০ টা ঘর দুটা কাঁটায় উঠান আছে সেই দুই কাঁটার ঘর এবং এখনকার দুই কাঁটার ঘর সমস্ত একত্রে আবার ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ১৬ লাইন ক্রমাগত একবার সোজা একবার উল্টা বুনিতে হইবে।

১৭ বার—সোজা, কেবল গোড়ালির শেষভাগের ঘর দুইবার দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে কারণ গোড়ালির দিকের ঘর ১৫ টা ১৫ টা করিয়া দুই কাঁটার আছে।

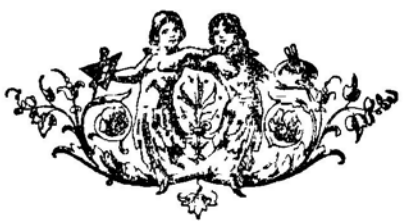
১৮ বার—উল্টা।

১৯ বার—সোজা, কেবল ১৭ বারে যেখানে যেখানে দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনা হইয়াছিল এবারেও সেখানে ২ টা একসঙ্গে সোজা।

২০ বার—উল্টা।

এখন ক্রমাগত ৮ লাইন সোজা, কিন্তু পূর্ব্বে গোড়ালির শেষদিকে যেরূপ দুইবার করিয়া দুইটা একসঙ্গে সোজা বুনিয়া ঘর কমাইতে হইয়াছিল এবারেও ঠিক তার উল্টা দিকে অর্থাৎ পায়ের পাতার দুই ধারের ঘরগুলি যে দুই কাঁটায় আছে এক লাইন অন্তর সেই দুই কাঁটারই একেবারে শেষদিকের দুইটা ঘর একসঙ্গে সোজা বুনিতে হইবে। এইরূপে বুনা হইলে পর মোজার উল্টা দিকে অন্য মোজারও যেরূপে মুখ বন্ধ করিতে হয় এই মোজারও সেইরূপেই করিতে হয়।

এখন ৩৫ ও ৩৬ বার বুনাতে মোজার যে ফাঁক ফাঁক ঘর হইয়াছে সেই ঘরের ভিতর দিয়া যে যে পশম দিয়া মোজা বুনা হইয়াছে সেই সেই পশম একত্রে পাকাইয়া ছবিতে যেরূপ দেখিতেছ সেইরূপ করিয়া দিয়া তাহার দুই ধারে দুইটা পশমের থোপ করিয়া দিতে হইবে। এই থোপও যে যে পশমের মোজা সেই সেই পশম দিয়া করিতে হইবে।



ধাঁধা।

গতবারের উত্তর।

১।—নোনা (No=না)।

২।—মরণ।

৩।—বর—গোবর।

৪।—মেঘ।

৫।—শিশু।

নূতন।

১। ভট্টাচার্য্যগণ মোরে বলেন বানর,
স্ত্রীজাতিরা মোরে কিন্তু করেন আদর।
পুষ্প কভু পত্র কভু যন্ত্র রূপ ধরি,
আমার নিকটে কিছু নাহি রয় ভারি।

২। কোন নিরাকার ফুল সাকার হইলে পোষাক হয়?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২ নং বেনিয়াটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।



IMPERIAL LIBRARY
1880
CUTTA

এপ্রেল, ১৮৮৫।

ঠাকুরদাদার গল্প।

শিশির।



কয়েক দিন পরে বালকগণ আবার একত্র হইয়া ঠাকুর দাদার নিকট উপস্থিত হইল,—ইচ্ছা বেড়াইতে গিয়া কোন বিষয়ে কিছু নূতন শিক্ষা করিবে। নবীন বাবুও প্রস্তুত, সন্তুষ্ট মনে সকলকে সঙ্গে লইয়া মাঠে বেড়াইতে গেলেন। আজ কি বিষয়ে কথা হইবে? নবীন বাবু সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বায়ুতে যে সব জলকণা সাগর, হ্রদ, নদ, নদী, প্রভৃতি জলাশয় হইতে উঠিয়া অদৃশ্য বাষ্পাকারে থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে কি কি বলা হইয়াছে? কোন্ কোন্ আকারে তাহাদিগকে দেখা যায়, মনে আছে কি?" সকলেই উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল "হাঁ, আছে বৈ কি? কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তুষার, এই কয়েকটীর কথা বলা হইয়াছে।" তখন নবীন বাবু হাসিয়া বলিলেন "বেশ্। তোমরা সব কথা মনে রাখিয়াছ ত? (সকলে "হাঁ")। তবে এখন বল দেখি আর কিসের কথা বলা বাকী আছে? সকলে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। মোহিতকৃষ্ণ চুপি চুপি গণেন্দ্রকে বলিল "কেন? শিশিরের কথা ত বলা হয় নি?" চারু ও কিশোরী হাস্য করিয়া বলিল "ছি মোহিত! তুমি দাদা বাবুকে লজ্জা কর? তাহ'লে শিখিতে পারিবে কেন? যাঁহার কাছে শিক্ষা করিব, তাহাকে কি লজ্জা করিলে হয়? তুমি ত বড় নির্ব্বোধ!" নবীন বাবু সকলকে শান্ত করিয়া বলিলেন "লজ্জা ও বিনীত ভাব একটু থাকা ভাল বটে, তবে কোনও বিষয়েই অধিক হওয়া উচিত নহে। সে যাহা হউক, অদ্য শিশিরের কথাই বলিব। হিম রাত্রে পড়ে, পাতা, ঘাস এই সকলেতেই বেশী পড়ে, গোলমাল করে না, ঝড় বহে না, তাই সকলে তাহাকে চিনে না জানে না, মনে রাখে না। শিশির প্রতি দিন পৃথিবীর গাছের পাতা সকলকে কেমন স্নান করাইয়া দেয়, কেমন সুন্দররূপে ফুলের পাপড়ীর গায়ে অমৃতের ফোঁটার মত দুলিতে থাকে, যেন ছোট শিশুর পবিত্র সুকোমল সোণার নাকে রূপার নলক দুলিতেছে! আহা! তাহা দেখিলে কে না আশ্চর্য্য হয়! মোহিত হয়! একেবারে পরমেশ্বরের খেলা দেখিয়া ও প্রকৃতির শোভা দেখিয়া প্রাণ মন পাগল হইয়া উঠে! যথার্থ, যখন শীতকালে মাঠের সবুজবর্ণের ঘাসগুলি

শিশিরে ভিজিয়া যায়, তাহাদের মধ্যে মধ্যে মাকড়সার জাল গুলা যেন রূপার সুতায় প্রস্তুত মনে হয়,- এমন সময়ে পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ করিয়া সিন্দুর-মাখাইয়া যখন সূর্য্য উঠিতে থাকেন, আর সেই রক্তিম আভা যখন ঐ শিশিরের গায়ে পড়ে—তখন, আহা! তখন যে কি এক চমৎকার শোভা হয়, তাহা বলা যায় না, কেবল দেখিলেই জানা যায়। তবে যে সে চক্ষে তাহা বুঝা যায় না, হাসতে খেলতে ছড়ি হাতে করে বাবু আনা করতে করতে হতভাগা ছেলেদের মত বেড়ালে সেই অপরূপ শোভা দেখা যায় না। শান্ত ও ভক্তিপূর্ণভাবে, নম্রতা ও বিনয়ের সহিত, গম্ভীর অথচ প্রশান্ত, অনন্ত শোভার ভাণ্ডার প্রকৃতির দিকে চাহিলে,- চাহিয়া আশ্চর্য্যের সহিত নমস্কার করিলে, তবে প্রকৃতি তার সেই গুপ্ত সুন্দর মনোহর রূপ দেখান। তা সে সকল এখন থাক্। শিশিরের শোভার কথা মনে এসে আমায় ভুলাইয়া দিয়াছিল। আমি ঐ সকল দেখিতে বাস্তবিকই পাগল হইয়া যাই। আহা! আহা!!" আর কথা বাহির হইল না। নবীন বাবুর দুটী চক্ষে দুফোঁটা জল দেখা দিল। অল্পক্ষণ সকলেই গম্ভীরভাবে পূর্ণ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর নবীন বাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

"বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অনেক জলীয় বাষ্প কমিয়া গেলেও বায়ুতে সর্ব্বদাই কিছু পরিমাণে বাষ্প থাকিয়া যায়। আমাদের দেশে প্রায় কখনই এমন সময় আসে না যখন বায়ুতে একটুও বাষ্প থাকে না। হাজার বৃষ্টি হউক, ঝড় হউক, শিল পড়ুক, খানিকটা বাষ্প বাকী থাকিবেই থাকিবে। ঐ সময়টা খুব কমিয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে বাষ্পহীন কখনই হয় না।" অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল "যখন খুব গ্রীষ্মের সময় ভয়ানক আগুনের হল্‌কার মত বাতাস বহে তখনও কি উহাতে জলীয় বাষ্প থাকে?"—নবীন বাবু উত্তর করিলেন—"তখনই আরও অন্য সময় অপেক্ষা বেশী থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বায়ু যত শীতল হইবে ততই উহার বাষ্প জল হইয়া পড়িবে, আর যত অধিক গরম হইবে, ততই উহার মধ্যে অধিক পরিমাণে বাষ্প ধরিবে। সে কথা তোমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। সেই জন্যই গ্রীষ্মকালে বায়ুতে বেশী বাষ্প মিশিয়া থাকে।"

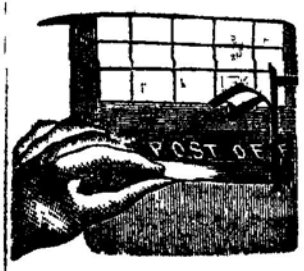
মন্মথ:-"সে কি রকম হবে? তাহ'লে ত ঠাণ্ডা লাগিত?"

নবীন বাবু:-"না, তা হবে কেন? জল হলেই কি ঠাণ্ডা হয়? গরম জল কি ঠাণ্ডা? তা যদি না হয় তবে গরম বাষ্প ঠাণ্ডা হবে কেন? বায়ু যখন গরম হয়, তখন তাহার বাষ্পও গরম হয়, কাজেই ঠাণ্ডা লাগে না। বুঝলে? (সকলে "হাঁ")। আবার আর একটা কথা বলিয়া রাখি, তোমরা যে মনে কর শীতকালে বায়ুতে খুব বেশী বাষ্প থাকে, তা ঠিক নয়, বড় ভুল। বরং শীত কালেই বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা বাষ্পহীন হয়। সে সময়ে বায়ু উত্তর দিক হইতে আসে। সে দিকে সাগর নাই কাজেই বাষ্প আনিবার সম্ভাবনা নাই। আর শীতকালে বাতাস শীতল, এজন্য উহার বাষ্প সবই প্রায় জমিয়া জল হইয়া যায়, কাজেই সে সময়ে বায়ুতে বেশী বাষ্প দাঁড়াইতে পায় না। আর কখন মনে করিও না যে শীতল হইলেই বাষ্প অধিক থাকে। বরং ঠিক তাহারই বিপরীত। গরম বাতাসে বাষ্প বেশী থাকে, ঠাণ্ডা বাতাসে বেশী বাষ্প থাকিতে পারে না, জল হইয়া যায়।"

কিশোরী—"কি আশ্চর্য্য! আমরা কি ভুলই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম! আজ বেশ শিক্ষা হইল।

সখার ক্রোড়পত্র।

এপ্রেল, ১৮৮৫।



ত্রপ্রেরকদের প্রতি।—

গত মাসে আমরা তিনখানি আশ্চর্য্য রকমের পত্র পাইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কিশোরগঞ্জ স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র, নিম্নলিখিত পত্র খানি আমাদের নিকট লিখিয়াছেন :—

"আমি মূল্য পাঠানের সময় কুপনে স্পষ্টাক্ষরে বাঙ্গালায় ও মনি অর্ডার ফারমের প্রত্যেক স্থানে যে স্থানে 'নাম লিখিবার নিয়ম' আছে তাহাতে লিখিয়াছি 'শ্রীঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য' কিন্তু কি আশ্চর্য্য মোড়কেও মূল্য প্রাপ্তি-স্বীকারে দেখি 'ঈশান চন্দ্র ভট্টাচার্য্য'।। যিনি এইরূপ লিখাও চিনিতে না পারিয়াছেন তাঁহাকে আমরা চশমা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। এই বৎসরের "সখার" ২য় পৃষ্ঠায় দেখিলাম কোন ব্যক্তি 'ব্রাহ্ম ভাব পূর্ণ' বলিয়া দোষ ধরে; আপনি লিখেন 'না', তাহা এখনি ৪৪ পৃষ্ঠায় রামতনু লাহিড়ীর জীবনীতে প্রকাশ করিতেছে।"

এই পত্রের উত্তরে এই মাত্র বলিতে চাই যে কুপনে কেবল মাত্র ঈ,চ,ভ, লিখিত ছিল এবং মণি অর্ডারের ফারমের অন্যান্য স্থানে ইংরাজীতে নাম লেখা ছিল। সেই ইংরাজী নাম অস্পষ্ট লেখার দরুণই বোধ হয় "ঈশ্বর" স্থানে "ঈশান" পড়িয়াছিলাম। অথবা "ঈশান" নামেই কাগজ পাঠাইতে করিয়াছিলাম। এই সামান্য ভুলের জন্য এত অভদ্র ব্যবহার কেন?

দ্বিতীয়তঃ 'ব্রাহ্ম ভাব', 'আর্য্যভাব' ইত্যাদি বলিয়া এত ছেলে বেলায় কেন পাগল হইয়াছেন? ধর্ম্ম বুঝিয়া কথা বলিলে দুঃখ হয় না। রামতনু বাবুর জীবনী সখায় প্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই কি সখা ব্রাহ্ম ভাব পূর্ণ? কৃষ্ণদাস পাল, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, অক্ষয়কুমার দত্ত ইহাঁরা হিন্দু কুলের গৌরব; ইহাঁদের জীবন চরিত ও সখায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের জীবন চরিত পাঠ করিলে বালকবালিকাদের উপকার হইবে তাঁহাদের জীবনীই সখায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগোলাম আফেজুদ্দিন, রাম নগর স্কুলের ছাত্র, এই রূপ লিখিয়াছেন: —

" মহোদয়!

অদ্য মার্চ্চ মাসের সখা প্রাপ্ত হইলাম। ইচ্ছা ছিল "ঈশ্বর পরম পিতা" নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, উহা মহোদয়ের গোচর প্রেরণ করি। কিন্তু ৩য় সংখ্যা 'সখা' দৃষ্টে আমার সমুদায় আশা ভরসা বিদূরিত হইয়াছে। আমাদের স্কুলে গবর্ণমেণ্ট হইতে 'সখা' আসিয়া থাকে। তথাপি আমি কেন গ্রাহক হইলাম? শুদ্ধ "গোলাম আফেজুদ্দিন, রামনগর স্কুলের ছাত্র" এই নামটী 'সখার' মূল্য প্রাপ্তি মধ্যে লিখিত হইবে, সেই জন্য। * * *

অনুগ্রহ প্রকাশে যদি এপ্রেল মাসের 'সখার' মূল্য প্রাপ্তি মধ্যে 'গোলাম আফেজুদ্দিন, রামনগর স্কুল' লিখা না হয় তবে ৩ সংখ্যার মূল্য কর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ট মূল্য ফেরত দেওয়ার আজ্ঞা করিবেন।" * * * * * *

১৯এ ফেব্রুয়ারি আপনি যে পত্র লিখেন তাহার মর্ম্ম এই :—

* * * ইতিপূর্ব্বে এক পত্র লিখিয়াছি তাহাতে ঠিকানার গোল ছিল সুতরাং না পাওয়াবই সম্ভব। তাহাতে 'আফেজুদ্দিন' নাম দিয়াছি, কিন্তু তাহা নহে; আমার প্রকৃত নাম গোলাম আফেজ। সখার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার আশায় ১৲ পোষ্টাল নোট পাঠাইলাম। * * *

পত্রানুযায়ী আমরা কাজ করিয়াছি। ইহাতে আমাদের কিছু মাত্র দোষ দেখি না।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আপনি কেবল মাত্র আপনার নামটী ক্রোড পত্রে মুদ্রিত দেখিবার জন্য 'সখার' গ্রাহক হইযাছেন।

গোয়ালন্দ গ্রামের শ্রীগোপাল গোবিন্দ সেন মহাশযেব নিকট বর্ত্তমান বর্ষেব অগ্রিম মূল্যের জন্য একখানি মুদ্রিত পোষ্টকার্ড পাঠাই এবং তদুত্তরে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"আপনাব ১৫ই ফেব্রুয়াবীর সুকব কমলাঙ্কিত বিচ্ছেদ পূর্ণ পত্র পাইযা এই হতভাগ্য কযেক দিন একেবারে অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইযা—পবক্ষণে অতলস্পর্শ বিচ্ছেদ সাগরে নিমজ্জিত হইযা—দিন রাত্রি তদীয় প্রাপ্য মূল্য ভাবিতে ভাবিতে অস্থিব প্রায়। * * * *

৫। এমন বংশে এবং এমন ক্ষণে জন্ম গ্রহণ কবি নাই যে, অন্যকে ঠকাই এবং অন্যের সঙ্গে ধূর্ত্তমী করি, আমার বংশে একেবাবেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না; বোধ হয় মহাশযের বুঝিবার ভুল?

৬। আর, মহাশয! 'সখা' যতদূর লইযাছি ততদূরই ভাল, আর লইবার আশা ও অনুরাগ নাই—থাকিবেই বা কেমনে? আমার মতন অধম ব্যক্তি আপনার ন্যায় মহৎ ও বুদ্ধিশালী লোকের লিখিত পত্রিকা লওয়া কোন মতেই সঙ্গত বেনা, কাজে কাজেই ক্ষান্ত।

৭। আমি কেবল দুই একটী পত্রিকা লই না; গ্রামে বাস কবি বলিয়া একেবারে অধম বলিয়াও বোধ কবিবেন না। সঞ্জীবনী, প্রজাবন্ধু, নব্যভারত, বঙ্গদর্শন*, বঙ্গবাসী প্রভৃতি অনেক পত্রিকা লইয়া থাকি তাঁহারা আমাকে ত আপনার মতন অবিশ্বাস কবেন না, ইহার কারণ কি? মহাশয় বলিতে পাবেন—

৮। থাকুক আর বেশী লিখিব না—ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনাব সখাব দিন দিন উন্নতি হউক। আমাব মত অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রার্থনা সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর শুনেন কিনা সন্দেহ!"

৯। সখাব প্রতি খণ্ডেব মূল্যই কত? এবং চাহেনই বা কত? শীঘ্র লিখিবেন তদুপবেই আপনার পাওনা বাকী মূল্যটা পাঠাইয়া দিয়া আমি অবিশ্বাসরূপ ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পাবি?

১০। এই পত্রে যদি কোন অপ্রিয় ভাষা অথবা Mistake থাকে তাহা স্বীয় মহৎগুণে মার্জ্জনা কবিতে আজ্ঞা হইবে। * * পত্রের উত্তব দিতে এত গৌণ হইয়াছে মাপ কবিবেন। এখন বিদায চাই।

এ পত্রের অর্থ কিছুই বোধগম্য হইল না।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ ও ১৮৮৪ সালেব বাঁধান সখা সখা-কার্য্যালয়ে বিক্রযার্থ প্রস্তুত আছে।

প্রত্যেক খণ্ড, কাপড়ে বাঁধান, ১৷৹
ঐ বোর্ডযুক্ত কাগজের মলাট, ১৷৵৹

প্রত্যেক খণ্ডের জন্য আলমাশুল ৵৹ দুই আনা মাত্র।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।

* বঙ্গদর্শন ত অনেক দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে; আপনি কি তবে এখনও বঙ্গদর্শন পান? আশ্চর্য্য বটে! স. সং।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ও মফঃস্বলে একটাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০, এবং ডাক মাসুল ৵১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটে "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া ৵০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৩। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্য সম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে রূপ ঠিকানা লেখা হয় তাহার উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

"সখা" কার্য্যালয়,
২ নং বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভ্রম সংশোধন।

গতমাসের ক্রোড় পত্রে ভুল ক্রমে "মার্চ্চ, ১৮৮৫" স্থানে "ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫" মুদ্রিত হইয়াছিল। "ফেব্রুয়ারি" স্থানে "মার্চ্চ" পড়িতে হইবে।

উক্ত ক্রোড় পত্রের ২য় পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ২৪ লাইন, "গঙ্গা গোবিন্দ" স্থানে "গুরু গোবিন্দ" পড়িতে হইবে। এবং ৩য় পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ২৩ লাইন, "ঈশান চন্দ্র" স্থানে "ঈশ্বর চন্দ্র" পড়িতে হইবে। এবং ২৯ লাইন, "মুন্সী গোলাম ছাফেজ" স্থানে "মুন্সী গোলাম আফেজুদ্দিন" পড়িতে হইবে।

মূল্য-প্রাপ্তি স্বীকার।

বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস,	শ্রীহট্ট	১৲
,, শরৎকুমার সরকার,	বোয়ালিয়া	১৲
সাধারণ পুস্তকালয়ের সম্পাদক,	বোয়ালিয়া	১৲
বাবু হরিচরণ সেন গুপ্ত,	বরিশাল	১
,, সোণারাম দত্ত,	জোরহাট	১৲
শ্রীমতী হেমনলিনী গুপ্তা,	পাবনা	১৲
,, মনোমোহিনী ঘোষ,	আটঘরিয়া	১৲
,, মনোরমা দেবী,	পাবনা	১৲
বাবু নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ, এম, এ, বি, এল,	জলপাইগুড়ি	১৲
,, বিষ্ণুচরণ চক্রবর্ত্তী,	বজ্রযোগিণী	১৲
,, গোবিন্দলাল রায় চৌধুরী,	মাছুলীয়া	১৲
শ্রীমতী প্রভাবতী দাস,	জামালপুর	১৲
বাবু অনাথবন্ধু সেন,	ঢাকা	১৲
,, রাধাকিশোর বসু,	শিবগঞ্জ	১৲
,, ঈশ্বরচন্দ্র দাস,	মতিগঞ্জ	১৲
,, মহেশচন্দ্র লাহিড়ী,	সাহারাণপুর	১৲
,, ভুবনচন্দ্র ঘোষ,	নলডাঙ্গা	১৲
,, গিরিশচন্দ্র রুদ্র,	খালিসপুর	২৲
,, যদুনাথ পাল এবং		
,, ভোলানাথ পাল,	হরিনারায়ণপুর	১৲
শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী রায়,	দেভোগগ্রাম	১৲
বাবু কুঞ্জলাল নাগ,	ঢাকা	১৲
,, নলিনীকান্ত নাগ,	নোয়াখালি	১৲
কুমারী শৈবলিনী বসু,	কলিকাতা	১৲
শ্রীমতী মনোমোহিনী গুহ,	কুন্দহার	১৲
বাবু গদাধর দাস,	বগুলা খাল	১৲
,, শরৎচন্দ্র দত্ত,	আরাকুল	১৲
মুন্সী আমির উদ্দিন সরকার,	পিঙ্গনা	১৲
শ্রীমতী নীরদা সুন্দরী গুহ,	ঐ	১৲

বাবু যামিনীকান্ত দাস,	পিঙ্গনা	১৲
„ শ্যামাচরণ দে,	ঐ	১৲
„ অশ্বিনীকুমার দত্ত,	এম্,এ,বি, এল্,বরিশাল	৮৲
„ দুর্গাকৃপা সেন,	চট্টগ্রাম	১৲
„ নটবর দে,	ফরিদপুর	১৲
শ্রীমতী নীরদা চট্টোপাধ্যায়,	জামালপুর	১৲
„ হরমণি দাস,	গৌরিশঙ্কর গ্রাম	১৲
বাবু আশুতোষ পাল,	হুগলি	১৲
,, নীলমণি মুখোপাধ্যায়,	বাণাঘাট	১৲
,, কৃষ্ণলাল দে,	কলয়া	১৲
স্কুলের ছাত্রগণ,	উত্তরবামভদ্রপুর	১৲
বাবু শ্যামাচরণ সিংহ,	যশোহর	২৲
শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী	মজুমদার, মাতলাখালি	১৲
,, পরমেশা দেবী,	বেলগাছী	১৲
বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়,	নকিপুর	১৲
শ্রীমতী ক্ষীরদাসুন্দরী ঘোষ,	কামারনগর	১৲
বাবু নীরদকৃষ্ণ রায়,	কৃষ্ণনগর	১৲
,, জ্যোতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	ফরিদপুর	১৲
শ্রীমতী সরলা সুন্দরী গুহ,	সামসিদ্ধি	১৲
বাবু মনোমোহন মজুমদার,	জামালপুর	১৲
„ রাখালদাস সান্যাল,	নবদ্বীপ	১৲
,, শরৎচন্দ্র হাজরা,	কাঁথি	১৲
,, ভূপালচন্দ্র সেন,	কালিয়া	১৲
,, কৈলাসচন্দ্র সিংহ,	বরিশাল	১৲
শ্রীমতী চন্দ্রবাসিনী দত্ত,	ঐ	১৲
,, স্বর্ণপ্রভা সিংহ,	ঐ	১৲
বাবু তারকচন্দ্র দাস,	চট্টগ্রাম	১৲
,, কৃষ্ণজীবন রায়,	ইচ্ছাপুর	১৲
,, কিশোরীমোহন রায়,	কাকিনা	১৲
,, সত্যপ্রিয় দাস,	আউটপুর	১৲
,, যতীন্দ্রলাল খান,	নাড়াবোল	১৲
,, বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত,	বরিশাল	১৲
শ্রীমতী শরৎকুমারী বসু,	নড়াল	১৲
,, বসন্তকুমারী বসু,	গয়া	১৲
,, স্বর্ণময়ী বসু,	সন্তোষগ্রাম	১৲
বাবু নলিনীকান্ত বিশ্বাস,	দরিয়াপুর	১৲
বালিকা বিদ্যালয়,	দাইন্যা	।০
বাবু কালিদাস দত্ত,	সাল্‌কিয়া	১৲
„ পবিত্রকুমার গুহ,	ফরিদপুর	১৲
শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী,	কলিকাতা	১৲
„ হেমন্তকুমারী বল,	মাওয়াগ্রাম	১৲
বাবু কালীপদ বসু,	গৌবাঙ্গচক	১৲
শ্রীমতী সরলা দেবী,	কলিকাতা	১৲
বাবু শশধর রায়,	মাণিকদহ	১৲
„ রক্ষাচরণ লাহিড়ী,	রঙ্গপুর	১৲
„ কালীচরণ সেন,	রুপঠা	১৲
প্রধান শিক্ষক,	বেগমগঞ্জ	১৲
বাবু প্রমথনাথ সেন,	পাটনা	১৲
শ্রীমতী কালীতারা সেন	শিমুলিয়া গ্রাম	১৲
„ কুসুমকুমারী রায়,	বরিশাল	১৲
বাবু রমণীকান্ত গুহ,	করটিয়া	১৲
শ্রীমতী ভগবতী বসু,	মালখানগর	১৲
বাবু নবীনচন্দ্র শর্ম্মা বি, এল্,	শ্রীহট্ট	২৲
শ্রীমতী তৌহিদন নেছা,	চন্দনবাড়ী	১৲
বাবু রাখালদাস বসু,	কুরিবপুর	১৲
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ,	ইতিনা	১৲
„ সূর্য্যকান্ত বাগ্‌চি,	সাহেবগঞ্জ	১৲
„ কৈলাসচন্দ্র ঘটক,	দিনাজপুর	১৲
„ নরদেব দাস,	বাকুড়করা	১৲
„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়,	তেলিনিপাড়া	১৲
,, প্রসন্নকুমার সেনকার,	নওগাঁ	১৲
„ গোকুলচন্দ্র কুণ্ডু,	কুমারখালি	১৲
„ কৈলাসচন্দ্র দত্ত,	কুমিল্লা	১৲

আরও চাই, বলুন দাদাবাবু! শিশির তবে শীতকালেই বেশী পড়ে কেন? বাষ্পই যদি শীতকালের বায়ুতে কম রহিল আর গ্রীষ্মকালে বেশী রহিল, তবে গ্রীষ্মকালে শিশিরের নামগন্ধও নাই আর শীতকালেই বা এত শিশির কোথা হইতে পড়ে? এ ভারী আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন না?"

মন্মথ, অমূল্য, গণেন্দ্র, চারু, নগেন, চন্দ্র, দেবন—সকলে একেবারে গোল করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমরাও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কিশোরী আমাদের সকলেরই কথা বলিয়াছে। এখন বলুন, শুনি।"

ছেলেদের ঐ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ও এরূপ উৎসাহ দেখিয়া নবীনবাবু মহা খুসী হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আর সব কথাই সহজ। বৃষ্টিরও যে নিয়ম, শিশিরেরও তাই। বাষ্প হইয়া বাতাসে মিশিয়া আছে, দেখা যাইতেছে না, হঠাৎ যে কোন কারণে যেই শীতল হইল, অমনি জল হইয়া দেখা দিল। এখন দেখ শীতকালেও বায়ুতে কিছু বাষ্প থাকে, তার উপর আবার দিনের বেলায় সূর্য্য যে উত্তাপ দিতে থাকেন, তদ্দ্বারা জলাশয় সমূহ হইতে অনেক বাষ্প উঠে। এইরূপে সন্ধ্যার সময়ে বা কিছু পূর্ব্বে বায়ুতে অনেক পরিমাণে বাষ্প জমা হয়। অন্য সময় হইলে উহা বাষ্প হইয়াই থাকিয়া যাইত, কিন্তু তাহা আর হইতে পাইল না। কারণ বায়ু শীঘ্রই খুব শীতল হইয়া যায় আর ঐ বাষ্প প্রায় সবই জল হইয়া পড়ে। সূর্য্য যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সকল বস্তুই গরম হয়, জলও গরম হয়, হইয়া বাষ্প হইয়া উপরে উঠে, বায়ুতে মিশে যায়। এই বায়ু যখন আবার শীতল হয়, তখন আর বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না। শীঘ্রই ইহা জল হইয়া যায়। এই জলকে শিশির পড়া বলে।

"এই সময়ে গরম হওয়া সম্বন্ধে দু একটা নূতন কথা বলিয়া দিই মন দিয়া শুনিবে। বড় শক্ত কথা এগুলি, খুব মন দাও। যত বস্তু আছে সকলেরই "তাপ-গ্রাহিতা" শক্তি আছে অর্থাৎ সকল দ্রব্যই তাপ দিলে উত্তপ্ত হয়, তার মধ্যে খানিকটা গরম প্রবেশ করে। তাপ যে কি, তাহা এখন বলিব না, তবে মোটামুটি এই জানিয়া রাখ যে সব জিনিষ তাপ দিলে গরম হয়। কোন বস্তু অনেক তাপ দিলে তবে গরম হয় আবার অন্য কোন বস্তু তাপ দিলেই শীঘ্র গরম হয়। মনে কর যেমন লৌহ প্রভৃতি ধাতু গুলি শীঘ্র তাতিয়া উঠে, জল তত শীঘ্র গরম হয় না। এখন বেশ বুঝিলে? সব জিনিষের তাপ-গ্রাহিতা শক্তি সমান নয়। এই গেল একটা কথা। আর একটা কথা এই যে সকল জিনিষেরই তাপ ছড়াইবার শক্তি আছে, অর্থাৎ কোন জিনিষ যদি গরম হয় তবে সেই তাপ সে সর্ব্বদাই চারিদিকে ছড়াইতে থাকে; নিয়ত, একটুও থামে না। ইহার নাম "বিকীরণ" শক্তি। এই শক্তি আছে বলিয়াই আমরা সূর্য্য হইতে উত্তাপ পাই, অগ্নি হইতে গরম পাই এবং গরম বস্তু হইতে গরম পাই। আর বাস্তবিকই এই শক্তি আগে তার পর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি। কেননা বিকীরণ না হইলে তাপ পাইব কোথায় যে গ্রহণ করিব? বুঝিতেই পারিতেছ? (সকলে—"বেশ্")। এই বিকীরণ অর্থাৎ তাপ ছড়াইবার শক্তি প্রত্যেক বস্তুরই আছে। তবে এখন আর একটা কথা বলি সেটা এই যে যে বস্তুর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি যে পরিমাণে অধিক তাহার বিকীরণ শক্তিও সেই পরিমাণে অধিক। অর্থাৎ যে বস্তু যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় সে বস্তু তত শীঘ্র আবার শীতলও হইয়া পড়ে। লৌহ যেমন শীঘ্র গরম হয়, আবার তেমনি শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যায়। একথা তোমরা অনেকেই জান।

কড়াতে দুধ জ্বাল দেওয়া হইলে দেখিতে পাব, ঐ দুধটা আর একটা পাত্রে ঢালিয়া কড়াটা খালি করিয়া রাখ, শীঘ্রই দেখিবে কড়া শীতল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুধটা তখনও যেন আগুন। আবার গরম হবার সময়ে কড়ার আংটা দুটীতে যখন হাত দেওয়া যায় না এমনি গরম, দুধ গরম হইবার তখনও অনেক বিলম্ব। এ তোমরা আজই বাড়ী গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিও। অর্থাৎ লোহার কড়া যত শীঘ্র গরম হয় তত শীঘ্র আবার শীতলও হয়, তাপ ছড়াইয়া বাহির করিয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। কিন্তু দুধ কম তাপ-গ্রাহিতা শক্তির জন্য গরম হইতে দেরী লাগে আবার তেমনি জুড়াইতেও বিলম্ব হয়, এই দ্বিতীয় কথা মনে রাখিবে। আর একটী কথা আছে—যখনই তাপ গ্রহণ করে সেই সময়েই আবার তাপ বিকীরণও করে। অর্থাৎ সকল বস্তু সকল সময়েই তাপ গ্রহণ ও বিকীরণ করিতেছে। তবে যার বিকীরণ অপেক্ষা গ্রহণ বেশী হয় সে জিনিষটা গরম হয়, আর যার গ্রহণ অপেক্ষা বিকীরণ বেশী সেটা ঠাণ্ডা হয়। ঐ কড়ার দৃষ্টান্তই ধর। উহা যতক্ষণ আগুনের কাছে থেকে তাপ গ্রহণ করিতেছিল, ততক্ষণ কি কেবল গ্রহণ করিতেছিল, বিকীরণ কার্য্য কি তখন বন্ধ ছিল? তা নয়, বিকীরণ ও করিতেছিল। তা না হলে তাহার নিকটে হাত লইয়া গেলে গরম ঠেকিত না। (সকলে "ঠিক") বেশ, দুটী কাজ এক সঙ্গে চলিতেছিল। কিন্তু বিকীরণ অপেক্ষা গ্রহণ অধিক করিতেছিল এজন্য তখন কড়া গরম বোধ হইল। আবার যখন নামাইয়া হাওয়ায় রাখা গেল তখন কি কেবল বিকীরণ হইতেছিল, তাপ গ্রহণ করিতেছিল না? তা নয়। তবে তখন বিকীরণই প্রবল, এজন্য ঠাণ্ডা হইয়া গেল। বুঝিলে? আচ্ছা বল দেখি মোহিত! চারিটা কথা কি?"

মোহিত :—"১ম, সব জিনিষের তাপ গ্রহণ করিয়া গরম হইবার শক্তি আছে উহার নাম তাপ গ্রাহিতা শক্তি। ২য়, সব জিনিষেরই আবার তাপ ছড়াইয়া শীতল হইবার শক্তি আছে, উহার নাম তাপ-বিকীরণ শক্তি। ৩য়, যে বস্তুর তাপ-গ্রাহিতা শক্তি যত প্রবল অর্থাৎ যাহা শীঘ্র গরম হয়, তাহার বিকীরণ শক্তিও তত প্রবল অর্থাৎ তাহা শীঘ্র আবার শীতলও হয়। ঠিক রাগের মত। কতকগুলা লোক শীঘ্র ঝাঁ করে রেগে যায়, আবার ঝাঁ করে রাগ পড়েও যায়, কিন্তু যাদের রাগ শীঘ্র হয় না, তাদের যদি রাগ হয় ত আর শীঘ্র পড়ে না। তেমনি যে বস্তুর তাপ গ্রাহিতা শক্তি কম, গরম হইতে দেরী হয়, তাহার বিকীরণ শক্তিও কম, উহা শীতল হইতেও দেরী হয়। ৪র্থ, প্রত্যেক বস্তুই এক সময়ে তাপ গ্রহণ এবং বিকীরণ দুইই করে, তবে যাহা অধিক হয় তাহাই প্রকাশ পায়, যদি বিকীরণ অপেক্ষা তাপ গ্রহণ করে বেশী তবে উহা গরম হয় নহিলে যদি গ্রহণের চেয়ে বিকীরণ বেশী হয় তবে শীতল বোধ হয়। অর্থাৎ ৫০ ভাগ তাপ গ্রহণ করিয়া যদি কোন বস্তু ১০ ভাগ মাত্র বিকীরণ করে তবে উহাতে ৪০ ভাগ তাপ থাকে তাই গরম দেখি কিন্তু তলে তলে যে দশ ভাগ বিকীর্ণ হইয়া গেল তাহা আর বুঝিতে পারি না এই রকম। নয় কি?"

নবীন বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন :—"মোহিত বেশ্ সুন্দর বুঝাইয়া দিল ত? তোমরা বলিতেছিলে মোহিত লাজুক। এই দেখ সে তোমাদের চেয়ে ভাল ছেলে। কেমন মন দিয়া শুনিয়াছে, কেমন দৃষ্টান্ত দুটী দিয়া বুঝাইয়া দিল। বেশ্ মোহিত! সে যাক্। এখন তোমরা সকলেই এই কয়েকটী কথা যদি মনে না রাখিতে পার তাহা হইলে আর শিশির পতনের কথা বুঝিতে

পারিবে না, বেশ্ মন দিয়া কথা কয়টী 'সখা'তে পড়িবে, আরও ভাবিবে, লোকের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া আলাপ করিবে ও কথা বার্ত্তা কহিবে; তার পর বুঝিতে পারিয়া স্মরণ করিয়া রাখিবে। আজ এই পর্য্যন্ত থাকুক। আর এক দিন বাকী সমস্ত কথা বলিব। শিশিরের কথা এক দিনে শেষ হইবে না। আজ রাত্রি হইল বাড়ী যাই চল।"

সকলে আশ্চর্য্য ও নূতন কথা শিখিলেন বলিয়া আনন্দ করিতে করিতে ও কৃতজ্ঞতার সহিত ঠাকুর দাদার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন।



শেয়ালের গল্প।



নুষের মধ্যে নাপিত যেমন, পাখীর মধ্যে কাক যেমন, দেবতাদের মধ্যে নারদমুনি ঠাকুর যেমন ছিলেন, লোকে বলে জানোয়ারদের মধ্যে শেয়াল তেমন। শেয়াল পণ্ডিত, সে কালে তাহার কত প্রতাপই ছিল। কুমীরের সাত ছেলে; শুনিয়াছি সব গুলিকে না কি শেয়ালের নিকট পড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। শেয়াল-পণ্ডিতও স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি করিয়া সাত দিনে সাত-টার সদ্গতি করিয়াছিল। তারপর কি হইল সকলেই জানে। কিন্তু পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এখন আর শেয়ালের সে দিন নাই। ইস্কুলে যত মাষ্টারি খালি হয়, একটা শেয়ালকেও তাহাতে দরখাস্ত পাঠাইতে শুনি না। কত জায়গায় কত শক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এখন আর তাহার মীমাংসার জন্য শেয়ালের কাছে যাওয়া হয় না। তবুও শেয়ালের যাহা আছে তাহাতে নাম রক্ষার কাজ চলে।

শুনিয়াছি শেয়াল কুকুরের জাতি। হইতেও পারে, নহিলে তাহাদের মধ্যে এত শত্রুতা কেন? তা ছাড়া অনেক সময় কুকুর ঠিক্ শেয়ালের মতন ডাকিতে পারে, শেয়াল ও মাঝে মাঝে কুকুরের ভাষায় আলাপ করিয়া থাকে। শেয়ালের ডাক সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিয়া থাকেন। অনেকে ঐ ডাকের অর্থ বেশ বুঝিতে পারেন। আমি বহু অনুসন্ধানে তিন প্রকারের ব্যাখ্যা সংগ্রহ করিয়াছি:—

১। প্রথম শেয়ালের পায় কাঁটা ফুটিল। সে কাঁদিল—"উঃ! আ।" দূর হইতে অন্য শেয়াল জিজ্ঞাসা করিল "ক্যা হুয়া?" গোল মাল শুনিয়া অন্যেরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ক্যা-ক্যা-ক্যা-ক্যা হুয়া?" তার পর সকলে মিলিয়া কতক্ষণ "আহা" "আহা" করিল, শেষে আহত শেয়ালকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিল যে "হুয়া তো হুয়া!"

২। প্রথম শেয়াল বলিল "আরে ওয়া? হা হা-হা!" দ্বিতীয় শেয়াল জিজ্ঞাসা করিল "ক্যা হুয়া" উত্তর হইল "মৈ রাজা হুয়া", শুনিয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল "আচ্ছা হুয়া!" "আচ্ছা হুয়া!"

৩। শেয়াল অন্য জন্মে তামাক খোর ছিল। অধুনা সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে। তাই প্রহরে প্রহরে সেই হুঁকো যন্ত্রের কথা তাহার মনে হয়; আর বেচারা ঘন ঘন 'হুঁক্কা' 'হুঁক্কা' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মনের অভাব জানায়।

প্রতি প্রহরেই শেয়াল ডাকে তাহাতেই তাহাকে সানঘোষ উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। শেয়ালের ডাক শুনিয়া এক রাজার মনে বড়ই কষ্ট হইল, তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্ত্রী ওরা কি চায়?" মন্ত্রী বলিলেন "বড় শীতে পেয়েছে কিছু খাবার চায়।" অমনি ৮ ঘণ্টা হইল ১০০০৲ টাকার সন্দেশ কিনিয়া ওদের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। ধূর্ত্ত মন্ত্রীর দশহাজার টাকা লাভ হইল। এক প্রহর পরে আবার শেয়াল ডাকিল। "এবারে কি চায়?" "বড় শীত, গরম কাপড় চায়।" হুকুম হইল লক্ষ টাকার বনাত কিনিয়া দাও। এক প্রহর পরে আবার শেয়াল ডাকিল। "এখন কি চায়?" "বড় মশা, মশারি চায়।" আসিল লক্ষ টাকা মঞ্জুর। আবার এক প্রহর পরে শেয়াল ডাকিল "এবারে কি চায়?" "এবারে কিছু চায় না, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করে।" অমনি রাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া কোটি টাকা মূল্যের শাল মন্ত্রীকে দিয়াদেলিলেন।

শেয়ালের একটা দুর্ব্বলতা আছে। এক শেয়াল ডাকিলে আর গুলি চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। আমার কোন বন্ধুর বাড়ীতে একটা শেয়াল খাবার খুঁজিতে আসিয়াছিল। স্বাভাবিক ধূর্ত্ততার সাহায্যে কেহ দেখিতে পাইবার পূর্ব্বেই সে একটা ঘরের ভিতর যাইয়া মাচার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানে কতক্ষণ ছিল বলা যায় না, কিন্তু সে সেখানে থাকিতে থাকিতেই জঙ্গলে একটা শেয়াল ডাকিল। অমনি আর কথা নাই, বেচারা দেশ কাল সব ভুলিয়া গিয়া সেই ঘরের ভিতর হইতেই "ক্যা হুয়া" "ক্যা হুয়া" প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। প্রশ্নের উত্তর আর জঙ্গল হইতে শুনিতে হইল না। বাড়ীর লোকেরা আসিয়াই সে বিষয়ে তাহার জ্ঞান পরিষ্কার করিয়া দিল।

শেয়ালের ধূর্ত্ততা সম্বন্ধে সকলেই কিছু কিছু জানেন। আমাদের একজন চাকর একবার একটা শেয়ালকে লক্ষ্য করিয়া ইট ছুড়িয়াছিল। দৈবাৎ ইটটা শেয়ালের কপালে লাগিল। লাগিবামাত্রই শেয়াল 'হিক' শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। শেয়াল মরিয়াছে শুনিয়া সকলেরই আনন্দ। তাহাকে টানিয়া ওঠানে আনিয়া সকলে বৃত্তাকারে তাহার চারিদিকে দাঁড়াইলেন। অনেক মন্তব্য প্রকাশের পর একজন বলিলেন "আমার সন্দেহ হয়, এটা মরে নি।" এবিষয়ে কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্ক হইল, তারপর একজন বলিলেন "অত কথায় কাজ কি, একটা লাঠি এনে দুঘা মেরে সন্দেহ দূর করে দাও না?" এই বলিয়া তিনি লাঠি আনিতে চলিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়াতে সে একটুকু ফাঁক হইয়াছিল, শেয়ালটাও সময় বুঝিয়া সেই খান দিয়া চম্পট করিল।

এক পাদ্রী সাহেব পাড়া গাঁয়ে থাকিতেন। সেখানে শেয়ালের বড় অত্যাচার, তাহার সবগুলি মুরগী খাইয়া ফেলিত। সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া খুব শক্ত একটা কাঠের ঘর করিলেন, তাহার ভিতরে মুরগী রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হইত। একদিন সাহেবের চাকরাণী মুরগীর ঘরে যাইয়া দেখে, যে একটা শেয়াল ঘরের ভিতর আসিয়া প্রায় সবগুলি মুরগী মারিয়া ফেলিয়াছে। কেবল কয়েকটী মাত্র প্রাণভয়ে উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে গুলিকেও উদরসাৎ করিবার জন্য চেষ্টায় আছে। চাকরাণীকে দেখিয়াই ধূর্ত্ত শেয়াল মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। সাহেব আসিয়া শেয়ালকে মৃতপ্রায় দেখিলেন এবং তাহার একটু আহ্লাদের বিষয় এই হইল যে খাইতে খাইতে পেট ফাঁপিয়া শেয়ালটাও মরিয়া গিয়াছে। এখন তাহার প্রেতাত্মার উদ্দেশে ইচ্ছামত গালিবর্ষণ করিয়া



তাহাকে অনেক দূরে মাঠে ফেলিয়া দিয়া আসা হইল। যিনি ফেলিয়া দিতে গিয়াছিলেন তিনি একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন যে শেয়ালটা দৌড়িয়া পলাইতেছে!

সংকেত।



আমার মনের ভাব উপরের তিনটী কথায় হয়তো অনেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন না। মুখে কথা না বলিয়া অন্য কোন চিহ্ন বিশেষ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার নাম সংকেত—অর্থাৎ আমি এ প্রস্তাবে যতবার সংকেত কথাটা ব্যবহার করিব ততবারই ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

কোন না কোন আকারে সংকেত সকল স্থানেই প্রচলিত আছে। আমরা দিনের মধ্যে কতবার সংকেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি! বন্ধু আসিয়া একটা কিছু করিতে অনুরোধ করিলেন, তুমি মাথা নাড়িলে, আমি তোমার উপর চটিয়া গিয়া ভয় প্রদর্শন করিলাম, তুমি মুখে কিছু না বলিয়া অঙ্গুলি বিশেষ উন্নত করতঃ আমাকে হনুমানের খাদ্য খাইতে বলিলে, ইত্যাদি, আর কত বলিব। এ সকলই সংকেত। এই প্রকারের সংকেত সকলেই কিছু কিছু ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ডে বোবা এবং কালারা এইরূপ সংকেতের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। হাতের এক এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া তাহারা ইংরাজি বর্ণমালার এক একটা অক্ষর বুঝায়। অক্ষর হইলে আর শব্দ রচনা শক্ত থাকে না। আমাদের দেশেও আছে।

"অহি, কুম্ভ, চক্র, টঙ্কার, তবল, পবন, যাতা।"

হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বলি। অর্থাৎ সাপের ফণার মত করিয়া হাত তুলিলেই একটী স্বরবর্ণ বুঝাইবে। এক হাতের মুষ্টির উপর আর এক হাতের মুষ্টি রাখিয়া কুম্ভের অনুকরণ (!!!) করিলেই ক বর্গের একটী অক্ষর বুঝাইবে। হাত ঘুরাইয়া চক্র, বাতাসে টোকা দিয়া টঙ্কার, হাতে বাতাসে ঢেউ তুলিতে চেষ্টা করিয়া তবল, পাখার কার্য্য হাতে করিয়া পবন, ও হাতে হাতে চাপিয়া যাঁতা করিলে, আর চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ (য র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ ইত্যাদি) সকলই ক্রমান্বয়ে হইতে লাগিল।

স্বরবর্ণ বলিয়া পাঁচ আঙ্গুল দেখাইলে পঞ্চম স্বরবর্ণ (উ) বুঝাইল, পবর্গ বলিয়া ও আঙ্গুল দেখাইলে আর পবর্গের তৃতীয় বর্ণ (ব) বুঝাইল। ইত্যাদি। একটা শব্দ শেষ হইয়াছে ইহা বুঝাইতে হইলে হাততালি দিতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক শব্দের শেষে হাত তালি পড়িবে।

প্রচলিত টেলিগ্রাফের অধিকাংশই সাংকেতিক। জাহাজের লোকেরা নানা প্রকারের নিশান ব্যবহার করিয়া সাংকেতিক আলাপ করিয়া থাকে। কখনও বা একটী মাত্র নিশান হাতে লইয়া, তাহাকে নানা প্রকারে নাড়িয়া সংকেত করা হয়। কখন মাথার টুপী হাতে করিয়া তদ্দ্বারা সংকেত করা হয়। আরো এত প্রকারে সংকেত করা হয় যে কি বলিব। কোন সময় এত দূরের লোককে সংকেত হয় যে এ সকল কিছুই তত দূর হইতে দেখা যায় না। তখন খুব উচ্চ জায়গায় ঘর করিয়া তাহার একটা দিক কেবল খড়খড়ি দ্বারা বন্ধ করা হয়। ঘরের ভিতরে আলো থাকে। খড়খড়ি খুলিলে সেই আলো অনেক দূর হইতে দেখা যায়। খড়খড়ি খুলিয়া কিছুকাল পর বন্ধ করিলে এক প্রকার সংকেত বুঝায়, আর খুলিয়া অমনি বন্ধ করিলে অন্য প্রকারের সংকেত বুঝায় এই দুই

প্রকারের সংকেত দ্বারা সব অক্ষর বুঝান যাইতে পারে। খড়খড়ি ওয়ালা ঘরের পরিবর্ত্তে অনেক সময় খুব উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা হয়। তখন তাহাকে একখানা তক্তা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলেই কাজ চলে। সংকেত করিবার সময় তক্তা খানা সরাইতে হয়, তবেই আলোটী দেখা যায়। তক্তা সরাইয়া অল্পক্ষণ রাখিলে একপ্রকার সংকেত আর অধিকক্ষণ রাখিলে অন্য প্রকার সংকেত বুঝায়।

সংকেতের কথা আমরা শেষ করিলাম। টেলিগ্রাফে যে সংকেত ব্যবহার করা হয় তন্মধ্যে মর্স সাহেবের সংকেত প্রণালীই অধিক প্রচলিত। মর্সের টেলিগ্রাফের সংকেত এই প্রণালীতে করা হয়। মর্সের টেলিগ্রাফে টাক্ টিক্ করিয়া শব্দ হয়, তাহার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা অনুসারে দুই প্রকারের সংকেত হইতে পারে। শেষ যত প্রকার সংকেতের কথা বলা হইল, সব গুলিই কেবল হ্রস্ব দীর্ঘ লইয়া হইয়াছে। শব্দ কি আলোক অধিকক্ষণ থাকিলে তাহা দীর্ঘ, তাহার চিহ্ন (—) এই রূপ। অল্পক্ষণ থাকিলে তাহা হ্রস্ব, চিহ্ন (-) এইরূপ।



মনোহর ছবি।



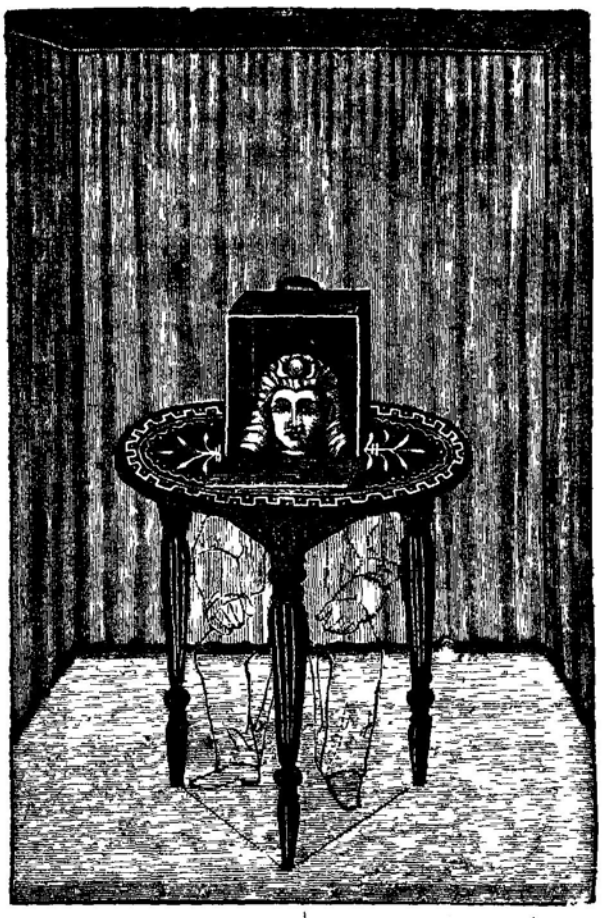
শীলা এগার বৎসরের বালিকা, তাহার দাদার নাম প্রিয়নাথ, বয়স চৌদ্দ বৎসর। দুই ভাই বোনে এত ভাব যে কেহ কাহাকেও অধিকক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। প্রিয়নাথ কিছু খাবার পাইলে আগে সুশীলাকে তাহার অর্দ্ধেক দিয়া পরে অর্দ্ধেক আপনি খাইত, সুশীলাও কিছু পাইলে দাদাকে না দিয়া খাইলে সুখ পাইত না। সকাল বেলা বিছানা হইতে উঠিয়া যখন দুই ভাই বোনে এক সঙ্গে বসিয়া এক মনে পড়াশুনা করিত তখন তাহাদিগকে দেখিলে সকলেরই চক্ষু শীতল হইত। প্রসন্ন বাবু যখন পাড়ায় ও গ্রামে সকলের মুখে আপন ছেলে মেয়ের গুণের কথা শুনিতেন তখন তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না।

একদিন বিদ্যালয় হইতে বাড়ী আসিয়া প্রিয়নাথ কোথাও সুশীলাকে দেখিতে পাইল না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে, সুশীলা তাহাদের ছোট বাগানে একটী বড় কামিনী ফুলের গাছের তলায় বসিয়া রহিয়াছে। সুশীলা তাহার ছোট ছোট দুখানি হাত জোড় করিয়া সজল নয়নে উপরদিকে চাহিয়া কি বলিতেছে। আজ তাহার কিসের দুঃখ যে সে এত কাঁদিতেছে? কেহ কি তাহাকে ধমকাইয়াছে বলিয়া সুশীলার অভিমান হইয়াছে? সুশীলার মত শান্ত ও ধীর মেয়েকে কি কেহ বকিতে পারে? সে যে ভুলিয়াও কোন অন্যায় করিতে জানে না। তাহার সেই কাঁদ কাঁদ নয়ন

দুটী, সেই কোমল ও সবল মুখ খানি দেখিলে আজ কাহার প্রাণ না গলিয়া যায়? প্রিয়নাথ সুশীলার দুটী একটী কথাও শুনিতে পাইল। সে কাতর ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে "হরি! শুনেছি তুমি বড় দয়াবান, দয়া করিয়া আমার পিতা মাতা ও ভ্রাতাকে সুখে রাখ, আমার বড় ভয় হয়, পাছে তাঁদের কাহারো অসুখ হয়, কাল থেকে মার যে মাথা ধরেছে, কি হবে ঠাকুর? তুমি ভাল ক'রে দাও। তোমার দয়াই সব সুখ দিতে পারে। দয়া ক'রে সকলকে ভাল রাখ।"

শুনিয়া প্রিয়নাথের মুখে কোন কথা বাহির হইল না, সে দেখিল সুশীলার ন্যায় গুণের ভগ্নী সকলের নাই। তাহার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার মন যেন পবিত্র হইল, সে ভাবিল "এই বুঝি স্বর্গ! আমি কখনও এত আনন্দ পাই নাই, সুশীলার কাছে দাঁড়াইয়া আমার এত আনন্দ হইতেছে, না জানি ইহার মত ভক্তিভরে ঈশ্বরকে ডাকিতে পারিলে কত সুখ ও আনন্দ হয়।" ধন্য সুশীলা, তোমাকে কেহ না শিখাইলেও তুমি আপনাআপনি পরমেশ্বরকে ডাকিতে শিখিয়াছ। সেই দিন হইতে তাহারা দুই ভাই ভগিনী প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সকল কায ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরকে কায়মনে ডাকিত। সেই দিন হইতে তাহারা দুই জনে কোন কষ্ট পাইলে পরম পিতার নিকট তাহা নিবেদন করিত। কিছুদিন পরে প্রিয়নাথের বড় পীড়া হইল, প্রিয়নাথ আর উঠিতে পারে না, আপনি খাইতে পারে না, এমন কি তাহার কথা কহিবার শক্তিও রহিল না। সুশীলা ভ্রাতার এই দশা দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুলা হইল। কিন্তু দুঃখে পড়িয়াও দাদার সেবা করিতে বিরত হইল না। তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই; যখনই দেখ, সুশীলা দাদার কাছে বসিয়া সেবা করিতেছে, রাত্রি জাগিয়া দাদাকে ঔষধ খাওয়াইতেছে। বারণ করিলেও সে রাত্রি জাগিতে ক্ষান্ত হইল না। ক্রমে ক্রমে প্রিয়নাথ আরোগ্য লাভ করিল বটে কিন্তু অত খাটিয়া ও অত্যাচার করিয়া সুশীলা নিজে পীড়িতা হইয়া পড়িল, পীড়িতা হইয়াও সে এক দিনের জন্য ঈশ্বরকে ডাকিতে বিরত হইল না। যখন সুস্থ ছিল, তখনও তাহার যেমন হাসি মুখ ছিল ঘোর অসুখের মধ্যে পড়িয়াও সেই সুন্দর ভাব নষ্ট হইল না। এত ক্লেশ যেন তাহার নিকট কোন ক্লেশ বলিয়াই বোধ হইত না। দেখিতে দেখিতে বালিকার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। বালিকাকে দেখিবার জন্য গ্রামের সকলেই একত্র হইলেন, তাহার সেই দশা দেখিয়া সকলেই কান্দিতে লাগিলেন। দাদাকে বাঁচাইতে পারিয়াছি এই ভাবিয়া মৃত্যু সময়েও সুশীলার মুখে আনন্দ দেখা গেল। ধন্য সুশীলা! আমরা তোমার ন্যায় বালিকা দেখি নাই। এমন বালিকাকে কাহার না ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়। এমন মনোহর ছবি ঘরে থাকে কাহার না সাধ হয়।





কাটামুণ্ডু কথা কয়।

একদিন বৈকালে কলুটোলা ষ্ট্রীট দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি—দেখিলাম একটি বাড়ীর পাশের ছোট একটি একতালা ঘরের দুয়ারে একজন মুসলমান বসিয়া ঘণ্টা বাজাইতেছে এবং বলিতেছে 'কাটা মুণ্ডু কথা কয়, দেখে যাও, এক পয়সা'। শুনিয়া সেই স্থানে একটু দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় একজন আপীষ ফেরতা বাবু ঘরের দুয়ারের পর্দ্দার আড়াল হইতে বাহির হইলেন। আমি তাঁহাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম 'মহাশয়! ব্যাপারটা কি?' বাবুটী উত্তর করিলেন 'মহাশয়! অতি আশ্চর্য্য, প্রকৃতই কাটা মুণ্ডুতে কথা বলিতেছে।' আমি বলিলাম 'কাটা মাথায় কি প্রকারে কথা কহিবে।' তিনি বলিলেন 'যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম তাহা কি আবার অবিশ্বাস করিতে হইবে। রক্ত গড়িয়ে পড়্‌চে, মহাশয়, বলেন কি? আপনার যদি সন্দেহ হয়

তবে একটা পয়সা খরচ ক'রে দেখে আসুন।' আমি দরজার লোকটাকে একটি পয়সা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিবার পথ নাই। কয়েকটী গেলাসের আলোতে ঐ ক্ষুদ্র গৃহটী কিয়ৎপরিমাণে আলোকিত হইয়াছে। দেখিলাম দ্বারের কিছু দূরে একটি সাদা কাপড়ের পর্দ্দা দ্বারা ঘরটী ছোট বড় দুই কামরায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ পর্দ্দাটী মেজে হইতে অনুমান দুই হাত উচ্চ। ঐ পর্দ্দার এক দিকে দর্শকেরা দাঁড়াইয়া দেখেন, অন্য দিকে মেজেতে একটি গোল টেবিল রহিয়াছে, তাহার সম্মুখের দিকের তিনটী পায়া ও তাহার উপর একটি কাঠের বাক্স দেখা যায়। এই কাপড়ের পর্দ্দার দ্বারা দুইটি কাজ হয়। প্রথমতঃ কোন দর্শক ঐ টেবিলের নিকটে যাইতে ও তাহার কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারেন না; দ্বিতীয়তঃ ঘাড় হেট করিয়া টেবিলের নিচু দিয়া টেবিলের পেছন দিক্‌কার ঘরের দেয়াল দেখা যাইতেছে কি না তাহা দেখা যায় না।

দর্শকেরা উপস্থিত হইলে টেবিলের উপরিস্থিত বাক্সটী উঠাইয়া লওয়া হয় এবং তাহার উপরে একখানা টিনের থালার উপর একটী রক্তাক্ত নরমুণ্ড দেখা যায়। একজন মুসলমান প্রশ্ন করিতেছে এবং টেবিলের উপরিস্থিত নরমুণ্ড উত্তর দিতেছে। নরমুণ্ডের কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইল যে ঐ মুণ্ডই কথা কহিতেছে, অন্য কোন লুক্কায়িত স্থান হইতে কেহ কথা কহিতেছে না। একবার মনে করিলাম যে টেবিলের উপর এমন কোন শিল্প-কৌশল আছে যাহার মধ্যে শরীরটী লুক্কায়িত রহিয়াছে; কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সেরূপ কিছুই নাই।

প্রিয় বালক বালিকাগণ! তোমরা কি কাটা মুণ্ডের কথা বলা দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক তবে তাহা কি প্রকারে হয় তাহা জান কি? এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিলে তোমরা জানিতে পারিবে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বারা নানা রকম আমোদ জনক বিষয় প্রস্তুত হয়।

তোমরা সকলেই দর্পণে আপনাপন মুখ দেখিয়া থাক। এক খানা কাচের পিছনে পারা মাখাইলে দর্পণ প্রস্তুত হয়। যতক্ষণ কাচের পৃষ্ঠে পারা মাখান না যায় ততক্ষণ তাহার মধ্য দিয়া অপর দিকের পদার্থ সকল দেখা যায়। কাচের পৃষ্ঠে পারা মাখাইলে আর তাহার মধ্য দিয়া কোন পদার্থ দেখা যায় না কিন্তু তাহার সম্মুখে কোন বস্তু ধরিলে তাহার প্রতিবিম্ব দর্পণের উপরে পড়ে। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! বাজিকরেরা বিজ্ঞানের এই নিয়মটী বন্ধন করিয়া কাটামুণ্ডের দ্বারা কথা বলাইতে পারে। উপরে যে টেবিলটির কথা বলিয়াছি ঐ টেবিলের সম্মুখে যে তিনটি পায়া আছে তাহাদের মধ্যে টেবিলের উপরের তক্তা হইতে মাটি পর্য্যন্ত বড় দুইখানি আয়না বসান আছে। ঐ আয়নার সম্মুখে যদি কোন পদার্থ থাকে, আয়নার উপরোক্ত নিয়মানুসারে তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয় কিন্তু ঐ আয়নার পেছনদিকে পারা মাখান থাকায় তাহার আড়ালে কোন দ্রব্য থাকিলে তাহা দেখা যায় না। আয়না দুখানি এমন কৌশলে বসান যে একটু দূর হইতে গেলাসের অল্প আলোকে আয়না যে আছে তাহা বুঝা যায় না। ঐ আয়না দুখানি পাশাপাশী সোজা বসান নহে; যে রকম বাঁকা করিয়া বসান তাহা উপরের ছবিতে দেখ।

বাজিকরেরা দর্শকদিগের বিভ্রম জন্মাইবার জন্য মেজেতে ঘাস এবং খড় ছড়াইয়া টেবিলের মধ্যস্থল হইতে প্রত্যেক আয়না যত দূরে আয়নার ঠিক তত দূরে সম্মুখে একটি গোল গেলাসে আলো দেয়। এইরূপ দুইখানি আয়নার সম্মুখে দুইটি গেলাস থাকায় তাহার প্রত্যেকটির প্রতিবিম্ব টেবিলের মধ্যস্থলে মেজের উপর পতিত হয় সুতরাং দর্শক আয়নার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ঠিক যেন দেখিতে পান যে টেবিলের নিচে ও বাহিরে সমস্ত মেজেতেই ঘাস বিস্তৃত এবং টেবিলের নিচে একটি আলো জ্বলিতেছে। গোল গেলাসে আলো দিবার কারণ বুঝিয়াছ কি? তোমরা যখন দর্পণে মুখ দেখ তখন দেখিয়া থাকিবে যে তোমার দক্ষিণ হাত ছবির বাম হাত, তোমার দক্ষিণ চক্ষু ছবির বাম চক্ষু অর্থাৎ তোমার উল্টা ছবি আয়নার উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। কেন এই প্রকার উল্টা ছবি হয় তাহা আমরা পরে বুঝাইয়া দিব। গোলাকার পদার্থ ভিন্ন আর সকল প্রকার পদার্থেরই দক্ষিণ বাম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে; কেবল গোলাকার পদার্থের দক্ষিণ বাম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে না, কারণ তাহার সকল দিকই গোল। অন্য আকৃতির আলোক দিলে পাছে দর্শক সম্পূর্ণরূপে না ঠকেন, কেহ দক্ষিণ বাম বিবেচনা করিয়া হঠাৎ ধরিয়া ফেলিতে পারেন এই জন্য চালাক বাজীকর গোলাকার গেলাস ব্যবহার করে।

এই প্রকারে দর্শকের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইয়া বাজিকর আয়নার পেছনে বসিয়া টেবিলের উপরিভাগে একটি ছিদ্র দিয়া আপন মস্তক বাহির করিয়া দেয়। ঐ ছিদ্রের উপর একখানা মাঝখানে কাটা টিনের থালা আছে; এই থালা খানি মানুষের গলার মাপে গোল করিয়া কাটা; তাহার দুই অর্দ্ধ দুইদিক হইতে ঠিক জোড়া দিয়া দেওয়া হয় তাহাতে বোধ হয় যেন আস্ত থালা খানার উপর মুণ্ডটি রহিয়াছে। পরে কিয়ৎপরিমাণ কৃত্রিম রক্ত আলতা ও মেজেণ্টা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ঐ থালায় ঢালিয়া রাখে এবং মুণ্ডের গলদেশে মাখাইয়া দেয়। ঐ মুণ্ড অর্থাৎ লুক্কাইত মানুষ কথা কহিতে থাকে। বোধ হয় যেন কাটা মুণ্ড কথা কহিতেছে। দেখ দেখ কেমন মজা।

বালক বালিকাগণ! বিজ্ঞান শাস্ত্রে এই প্রকারের বহুবিধ আমোদের জিনিষ আছে। তাহার কতকগুলি আমরা ক্রমশঃ তোমাদিগকে শিখাইয়া দিব।



প্রাণ কাঁদা চাই।

আমাদের একজন বন্ধু সম্প্রতি এক গ্রামে স্কুল গৃহে রজনীতে শয়ন করিয়াছিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, স্কুলের ২।৩ খানি বেঞ্চ একত্র করিয়া তাহার উপর শুইয়াছেন। এজন্য ভাল ঘুম ও হইতেছে না, কাজেই আপন মনে শুইয়া শুইয়া কত কথা ভাবিতেছেন,—এমন

সময়ে কে যেন গুন্ গুন্ করিয়া বাহিরে গান করিতেছে শুনিতে পাইলেন। অল্পক্ষণ শুনিয়া মনে সন্দেহ হইল, বুঝি গান নহে। তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, আসিয়া দেখেন যে দুইটী স্ত্রীলোক, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কাঁদিতেছে; নিকটে গেলেন, কিন্তু তাহাদের জীর্ণ শীর্ণ দেহ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, বুক দুর দুর করিতে লাগিল। আহা! আহা! বুঝি ইহাঁরা পীড়িত। অসহায় অবস্থায় এখানে কি জন্য আসিল? এই সব চিন্তায় তাঁহার খুব দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা উত্তর পাইলেন, তাহাতে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। অতি ক্ষীণ স্বরে স্ত্রীলোক দুটী উত্তর করিল—"মহাশয়। আমাদের যে ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে, তাহাতে আমরা এখনই মরিয়া যাইব। এতক্ষণ অজ্ঞানের মতন হইয়া ছিলাম এখন যেন সর্ব্ব শরীর কি করিতেছে, আর বাঁচি না। না খেয়ে খেয়ে আমাদের শরীরে আর কিছুই পদার্থ নাই।"

আমাদের বন্ধু জানিতেন যে সে গ্রামের চারিদিকে খুব দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সুতরাং তখনই বুঝিলেন যে ঐ দুটী স্ত্রীলোক দুর্ভিক্ষের জ্বালায় কাতর হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল, হয়ত কোথাও কিছু না পাইয়া শেষ ক্লান্ত হইয়া ঐ স্থানে পড়িয়া মরিতে বসিয়াছে। কাল সকাল বেলা আর তাহাদের কেহ জীবিত দেখিতে পাইবে না, এমন অবস্থা হইয়াছে। রাত্রি তখন ১টা কিম্বা ২টা। এত রাত্রে কোথায় খাবার পাবেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সন্ধ্যা অবধি ত আমরা এখানে রহিয়াছি এতক্ষণ বল নাই কেন?" আহা! বলিবে কি? নিষ্ঠুর মানুষ!—যাহাদিগকে বলিয়াছিল, তাহারা দিল না, হয়ত তাহাদের কিছুই দিবার ছিল না। যাহা হউক হতাশ হইয়া ও মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া হতভাগিনী রমণী দুজনেই শীতে হিমে বাহিরে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। পাষাণ ও তাহাদের অবস্থা দেখিলে গলিয়া যায়। আমাদের উক্ত বন্ধুর চক্ষে আর জল ধরিল না, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং ঐ হতভাগিনীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তত রাত্রে কার বাড়ী বা যাবেন? মনে করিলেন স্কুল ঘরটাই খুঁজিয়া দেখিবেন। তাহাই করিলেন, ঘরটার চারিদিক আতিপাতি করিয়া খুঁজিলেন। এক কোণে এক গ্লাস দুধ ও একটু চিনি দেখিতে পাইলেন। ঐ খাবার টুকু পাইয়া তাহার যে কি আহ্লাদ হইল তাহা আর কি বলিয়া জানান যায়? আমাদের পাঠক পাঠিকাদের ত আর পাথরের চেয়েও শক্ত হৃদয় নয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই হতভাগিনী স্ত্রীলোকদের এরূপ ভয়ানক দুঃখের কথা শুনিয়া কাঁদিতেছেন। এখন, সেই দুধ ও চিনি টুকু পাওয়াতে সকলেরই আনন্দ হইল। উহা কোথা হইতে আসিল? কে এই অন্ধকারে স্কুল ঘরে রাত্রি দুটোর সময়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মৃতপ্রায় দুটী লোকের জন্য দুধ চিনি দিয়া গেল? ভাবিলে ভক্তিতে আর কৃতজ্ঞতাতে প্রাণ ভরিয়া যায়। সন্ধ্যার সময়ে আমাদের ঐ বন্ধুর চা খাওয়ার জন্য ঐ দুধ চিনি আসিয়াছিল, ঘটনাক্রমে কোন কারণে তাঁহার উহা খাইতে মনে ছিলনা। ভাগ্যে এরূপ অভাবনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল, না হইলে সেই রাত্রে দুটী প্রাণীর মৃত্যু হইত, দুটী মানুষ—আমাদের মত দুটী প্রাণ, অনাহারে,—আহা! না খেতে পেয়ে,—মারা যাইত।

সেই দুধ আর চিনি টুকুতে একটু গলা ভিজাইয়া তাহারা যেন বাঁচিল, বাঁচিবার আশা হইল। তখন তিনি তাহাদিগের হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে আনিলেন, না হইলে শীতে তাহারা বাঁচিত না। ঘরে আনিয়া যত্ন করিয়া শোয়াইলেন। পরে প্রভাত হইলে সকলের নিকট ভিক্ষা করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইলেন। আহা! দীন হীন, দুঃখী অসহায় মৃতপ্রায় দুটী প্রাণী তাঁহার জন্য বাঁচিয়া গেল।

এইরূপে কত গ্রামে দুর্ভিক্ষের পীড়ায় যন্ত্রণা পাইয়া কত লোক যে, কত অসহ্য কষ্ট পাইতেছে তাহার ঠিক নাই? গবর্ণমেণ্ট অনেক সহায়তা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি ও আমাদের যে সকল বন্ধুরা নিয়ত ঐ সকল দীন দুঃখীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের মুখে ও শুনিতেছি যে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে যাহা হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না, এজন্য নানা স্থান হইতে নানা দেশ বিদেশ হইতে দয়ালু লোকে সাহায্য করিতেছেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের চারিদিকে কত হাজার হাজার লোক যে যন্ত্রণা পাইতেছে তা মনে করিলে ও বুক ফাটিয়া যায়। সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমাদের আর কি সাহায্য করিতে বলিব? তোমরা শিশু, পয়সা টাকা কোথা পাবে? তবে একটা কথা বলিতে পারি। সেটা এই:— **যখন তোমাদের খাবার সময় হবে, তখন যেন সেই দীন হীনদের কথা মনে ক'রে একটু দুঃখ হয়, তাদের দুঃখে দুঃখী হ'লে, পরমেশ্বরের কাছে তাদের দুঃখ নিবারণের জন্য তোমরা প্রার্থনা করিলে ও তাহাদের মঙ্গল হবে। আর কিছু হউক আর না হউক, তোমাদের হৃদয়ের খুব** উন্নতি হবে। রোজ একবার দুবার করিয়া তোমরা হতভাগ্য নরনারীর কথা চিন্তা করিও, রোজ বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়া তাহাদের দুঃখ মোচন করিতে তোমরা পার কি না সে বিষয়ে পরামর্শ করিও। আর যদি কিছু পয়সা যোগাড় করিতে পার তবে আমাদের কাছে হউক বা বঙ্গবাসী কি সঞ্জীবনীর কাছে বা অন্য কোন স্থানে পাঠাইয়া দিও। দুঃখিত হওয়া চাই, প্রাণ কাঁদা চাই।

বসন্ত সঙ্গীত।

(১)

আইলাম আজ আমি এত দিন পরে,
বহুদিন থেকে সবে ডাকিতেছ মোরে,
মধুর তপন তাপ লইয়া সাথেতে
দেখবে এসেছি আমি জগৎ মোহিতে।

(২)

মলয় হইতে বায়ু বহিছে আমার,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম ফুটিছে অনিবার,
আমারে দেখিয়া যত তরু লতা রাজি,
সন্তাষে যতনে নানা ফল ফুলে সাজি।

(৩)

শীতকালে যেই বৃক্ষ মৃতপ্রায় ছিল,
মম আগমনে তারা জীবন পাইল,
ফুটিল শাখায় তার কুসুম সুন্দর,
মধুর গুঞ্জন তাহে করে মধুকর।

(৪)

দেখবে নিকুঞ্জ বনে কি শোভা ধরেছে,
পাতায় পাতায় ফুল কেমন ফুটেছে,
তদুপরে বিহঙ্গম সুমধুর রবে
পুলকে আমার বার্ত্তা জানাইছে সবে।

(৫)

ওই বসি পিক কুল গাছের শাখায়
গাইছে মধুর গীত শুনাতে আমায়;
ফুলের সৌরভ মাখি মৃদুল পবন
আমার বারতা লয়ে ধায় অনুক্ষণ।

(৬)

দেখবে চাহিয়া নদী কি শোভা ধরেছে
রূপের ছটায় যেন চমকি চলিছে,—
ফুটেছে তাহার পাশে সুরভি বকুল
সৌরভ পাইয়া তথা ধায় অলিকুল।

(৭)

দেখবে কানন মাঝে ফুল কত জাতি—
সুন্দর বরণ কিবা—ফোটে দিবা রাতি,
কে ন স্থানে ফুটিয়াছে গোলাপ কলিকা,
শোভিতেছে কোন স্থানে চারু সেফালিকা।

(৮)

দেখবে চাহিয়া ওই পর্ব্বত ভেদিয়া
বহিছে ঝরণা কিবা দিক উজলিয়া,
ভানুর কিরণ রাশি পড়িছে তাহায়,—
কি সুন্দর শোভা আহা ধরিয়াছে তায়

(৯)

বালক বালিকা সবে আমারে দেখিয়া
মধুভাষে ডাকে মোরে আনন্দে মাতিয়া,
আমার সুন্দর ফুল তুলিয়া আদরে
পরিতেছে কত স্থানে কত যত্ন করে।

(১০)

বালক বালিকা তোরা আয়রে ছুটিয়া
আয়রে তোদের সাথে খেলিব বসিয়া;
আমার বিকাশ কালে তোমরা কখন
থেক না থেক না কেহ বিষাদে মগন।

(১১)

বালক বালিকা তোরা আয় ছুটে আয়,
বড় ভাল বাসি তোদের কোমল হৃদয়;
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা আদি পরিহরি আয়;
দূর করি কুবাসনা আয় সবে আয়।

(১২)

যেই জন রচিলেন এ বিশ্ব ভুবন,
যাঁহার কৃপায় মোর এরূপ মোহন,
তাঁহার মহিমা গান আয় সবে গাই,
সরল হৃদয়ে আয় তাঁর পানে চাই।

ধাঁধা।

গত বারের প্রশ্নের উত্তর।

১। কপি।

২। (এইটীতে ভুল হইয়াছিল। "ফুল" (কথাটী "ই হ্রস্ব" হইবে) ইহার উত্তর—"চোক," চোর+আ=চোকা)

নূতন।

১। তিন বর্ণে নানারূপে করি বিচরণ,
সবার নিকটে আমি আদরের ধন।
দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ণে করিলে মিশ্রণ
পশু হয়ে করি আমি কাননে গমন।
আদি অন্তে মিলাইলে কম্ম হয়ে যাই,
তৃতীয়ে ছাড়িলে আমি ক্ষুদ্র মুদ্রা হই।
সুবোধ তোমারি হাতে রহিয়াছি আমি;
চিনিতে পারিলে কিহে বল দেখি তুমি।

২। এক গৃহস্থের বাগানে এক সারিতে ৩৬টী আমের গাছ ছিল। ১ম গাছটীতে ১টী, ২য় টীতে ২টী, তৃতীয় টীতে ৩টী এইরূপে ৩৬শ টীতে ৩৬টী আম হইত। ঐ গৃহস্থ মৃত্যু সময়ে উক্ত ৩৬টী গাছ তাঁহার ছয় পুত্রদিগকে দিয়া যান এবং বলিয়া যান যে প্রত্যেকের ভাগে যেন ছয়টী করিয়া আম গাছ হয় এবং আমের সংখ্যাও যেন প্রত্যেকের সমান হয়। বল দেখি কে কোন্ কোন্ গাছ পাইবে?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২ নং বেনিয়াটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।



মে, ১৮৮৫। বৈশাখ, ১২৯২।

নব বর্ষ।

মহা হর্ষ নব বর্ষ আস্‌ছে শিশুগণ!
কেমন মজা নূতন রাজা দিলেন দরশন।
রাঙ্গা রবি—সোনার ছবি—সরস হাসি হাসে,
বল্‌ছে সবায় "দেখ্‌বিত আয় নূতন রাজ আসে।"
সুবাস লয়ে ত্বরিত হয়ে মলয় পবন চলে,
"গাও হে চেতন, লোক সাধারণ! রাজা এলেন বলে"

পক্ষীগণে খুসী মনে গায় মঙ্গল গান,
কুসুম সুখে কোমল মুখে হাস্‌ছে খুলে প্রাণ।
সকল ধরা সুখে ভরা বিভুর মহিমায়,—
এল নূতন আদরের ধন, পুরাতন ঐ যায়।
দেখ্‌ছে সবে ভক্তিভাবে নববর্ষে চেয়ে,
তোমরা সবাই জাগ্‌বে কি ভাই নূতন জীবন লয়ে?

সময় গেলে রত্ন দিলে আর তো নাহি পায়,
অমন ধনে, অবোধ জনে, হেলায় হারায়।
গত বর্ষ গেল ওই চক্ষে দিয়ে ধুলো!
হা করিয়ে রইল চেয়ে অলস ছেলে গুলো।
দেখ দেখি কি ফাঁকিতে প'ড়ে গেল তারা,
শেখ দেখে এখন থেকে পাঠক পাঠিকারা।

পরাণপণে বিদ্যাধনে করবে উপার্জ্জন,
গরিব লোকে দয়ার চোকে দেখো সর্ব্বক্ষণ।
স্বার্থ আর অহঙ্কার দিস্‌না মনে ঠাঁই,
আত্মসুখে মত্ত হয়ে করিস্‌নে বড়াই।
কর চেষ্টা যাতে শেষটা পরম সুখে রবে,
তোমায় দেখে সকল লোকে "দেশের রতন" কবে।

নূতন বছর নয়নগোচর যাঁহার করুণায়,
এস সবে ভক্তিভাবে প্রণমি সে পায়।
মাগি ভিক্ষা করুন রক্ষা ভারত-বন্ধুগণে,
দেশের হিত সুসাধিত হউক দিনে দিনে।
দুর্ভিক্ষেতে এ বারেতে হ'ল বড় ক্লেশ,
সে হাহাকার না থাকে আর, বাঁচে যেন দেশ।
অধম তারণ কাঙ্গাল-শরণ পিতা দয়াময়,
দিউন শক্তি, তাঁতে ভক্তি সদাই যেন রয়।
তাঁর দয়াতে কুশলেতে থাক ভাই বোন্!
সুখী হও, সুযশ পাও, বিমল হউক মন!



হাসি, কান্না, কোন্‌টা ভাল ?



যার সুখ সেই হাসে ; আর যাহার দুঃখ সেই কাঁদে। তাই জিজ্ঞাসা করি ভাই পাঠক পাঠিকা যে বৎসর গেল ইহাতে তুমি বেশী হাসিয়াছ না কাঁদিয়াছ ? যে বালক বালিকা নিজের উন্নতি করিতে এবং অপর দশ জনের উপকার করিতে গত বৎসরের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন আমরা অধিক হাসিয়াছি।



আর যে সকল ছেলে নিজের উন্নতির কথা ভুলিয়া গিয়া দিন রাত্রি 'মজা' করিয়া কাটাইতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিবার আগেই আমি বুঝিতেছি তাঁহাদের সুখ হয় নাই। ছবির দিকে একবার তাকাও দেখি। হাসির চেহারা গুলি দেখিতে ভাল, না—কান্নার চেহারা গুলি? তবে যাহাতে, বছরের শেষে 'কি করিয়াছি' ভাবিতে বসিয়া মনের সুখে হাসিতে পার কেন সেই জন্য যত্নবান্ হও না?

লীলার ভয়।

আজ লীলাবতীর বাবা ও মা কেহই বাড়ীতে নাই। বাবা কোন কাজে বাহির হইয়াছেন। লীলার মা তাঁহার এক বন্ধুর অসুখ হওয়াতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন। লীলার উপর বাড়ীর সমস্ত ভার। নলিনীকে ও খোকাকে রাখিতে হবে। মা বলিয়া গিয়াছেন "লীলা! বাড়ীর সমস্ত ভার তোমার হাতে রহিল, তুমি বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইও না; খুব সাবধানে থাকিবে যেন বাড়ীতে কেহ না আসে; নলিনী ও খোকাকে বেশ সাবধান করিয়া রাখিবে, আমি শীঘ্রই আসিব।" লীলা মাতার কথা গুলি মন দিয়া শুনিয়াছিল, ও তাহা পালন করিবে বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল। একাদশ বর্ষীয়া বালিকা লীলা আজ এ বাড়ীর গৃহিনী। সে নলিনীকে খাবার দিয়া, খোকাকে লইয়া খেলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বেলা চলিয়া গেল; যখন চারিদিক আঁধার হইয়া আসিল, তখন লীলাও আপন ঘরে প্রদীপ জ্বালিল। ভাইটীকে অনেক চেষ্টা করিয়া ঘুম পাড়াইল। নলিনীও ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। লীলা এখন সেই নির্জ্জন ঘরে একাকী বসিয়া ভাই বোনকে পাহারা দিতে লাগিল। বেচারা লীলা অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া মার অপেক্ষা করিতেছে, আর পারে না। কে জানে কেমন একটা লুকান ভয় তাহার প্রাণকে কাঁপাইতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। বুক দুর দুর করিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল কে যেন পিছুতে বসিয়া আছে, সরিয়া দেখিল কেহই নয়। কি আপদ! লীলা আর কি করে? তবু বোধ হইতে লাগিল কে তাহার পিছনে। একে এই ভয় তাহাতে আবার কাহার চলন ফেরনের খস্ খস্ শব্দ হইতে লাগিল। আহা! লীলা অনেক সহ্য করিতেছে, আর পারে না। একবার একবার ইচ্ছা করিতেছে যে বাড়ী ছাড়িয়া দৌড়িয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু মার কথা মনে জাগাতে তাহা পারিয়া উঠিতেছে না। বিষম পরীক্ষা। একদিকে ভয়ানক ভয়ে লীলার পা দুখানিকে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়, আর এক-দিকে মার কথা তাহাকে ধরিয়া রাখে—অনেক কষ্টে এখন পর্য্যন্তও ভাই বোনের বিছানার পাশে বসিয়া আছে। হঠাৎ খট্ করে কি যেন খুলিবার শব্দ হইল, অমনি ভয়ে চীৎকার করিয়া লীলা লাফাইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে 'মিউ' 'মিউ' করিয়া তাহার বিড়ালটী শয্যা পার্শ্বে বসিল। এতক্ষণ পরে লীলাবতীর ঘাড়ে ভূত চাপিল। সে মনে করিল "৭টা বাজিল, মা বাবা কেহ আসিতেছেন না; আমি খিড়কি দরজা দিয়া বাহিরে গিয়া দেখি মা আসিতেছেন কিনা?" কাজেই ভাই বোনকে একাকী রাখিয়া খিড়কি দরজা খুলিয়া দেখিতে গেল। দ্বার খুলিয়া মাঠ পানে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিল জন প্রাণীও তাহার চক্ষে পড়িলনা। অনেকক্ষণ দাঁড়া-ইয়া পা দুখানি ধরিয়া গেল, তবুও মা এলেন না। এতক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। 'মা ত এলেন না; যাই তাদের দেখি হয়ত বাড়ীতে কোন চোর ঢুকিয়াছে।' এই বলিয়া সে যেমন সিঁড়ির কাছে আসিয়াছে, অমনি বাড়ীর ভিতর মানুষের পায়ের শব্দের মত 'খট' 'খট' শব্দ শুনিতে পাইল। কি সর্ব্বনাশ! মার কথা না শুনিয়া যাহা

হইবে বলিয়া ভয় পাইয়াছিল, হায় হায় তাহাই হইয়াছে। সর্ব্বনাশ! বাড়ীতে নিশ্চয়ই চোর ঢুকিয়াছে কোন সন্দেহ নাই। লীলা! কেন বাড়ী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, এখন ভোগ কর। সে আর ভয়ে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না। আস্তে সিঁড়ির তলায় লুকাইয়া—ঘরে কে ঢুকিয়াছে তাহাই দেখিতেছে। দেখিতে লাগিল বটে কিন্তু লীলাতে আর লীলা নাই—ভয়ে প্রায় চেতনা হারা হইয়াছে। যদিও শীত কাল তথাপি অত্যন্ত ঘামিতেছে, তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

লীলা দেখে বারাণ্ডার আলো ক্রমে ক্রমে ঘরের কাছে আসিতে লাগিল। দেখে একজন লোকে বাতি হাতে করিয়া তাহাদের বিছানার কাছে আসিতেছে। আর লীলা স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। সে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "তুমি আমার ভাই বোনকে ছুঁতে পাবে না। আমি ছুঁতে দেবোনা। দেবো না।" লীলার কথা শুনিয়া লোকটী বলিয়া উঠিলেন "আরে! এই যে এখানে!" লীলা বুঝিল ইহা তাহার পরিচিত গলা; কিন্তু কাহার গলা তাহা তখন বুঝিতে পারিল না। তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন "ওগো! লীলাকে কোথায় খুঁজিতেছ? এই যে লীলা! (লীলার প্রতি) কি মা! কোথায় ছিলে, আমরা তোমাকে সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম।" লীলা বাবার মুখ পানে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুই বলিতে পারিল না। মাতা ঘরে আসিয়া লীলাকে কিছু শক্ত কথা শুনাইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, মুখখানি নীলবর্ণ; কাজেই শক্ত কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। মা একটু তিরস্কার করিলেন। বকুনি খাইয়া লীলার চৈতন্য হইল, মুখ দিয়া একটী দুটী কথাও বাহির হইল।—"তুমি কোথা দিয়ে এলে, আমিত দেখিতে পাই নাই। আমি ৭টা থেকে পিছনের উঠানে দাঁড়াইয়া তোমায় তল্লাস করিতে ছিলাম।"

মাতা। এতক্ষণ! তুমি কি এখন এলে। আমি সামনের দরজা দিয়া আসিয়াছি। তোমার শরৎ মাসীমার অত্যন্ত অসুখ বাড়িয়াছে তাই এত দেরী হ'য়ে গেল। বড় ক্লান্ত হয়েছ, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন কর।

বাবা। আহা! লীলা আমার, ভাই বোনদের রক্ষা করিবার জন্য আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল।

লীলা লজ্জায় বাবার বুকের ভিতর মুখখানি লুকাইয়া ধীরে ধীরে বলিল "না বাবা আমার দোষ নাই, আমি একলাটী ছিলাম। কেহই আমার কাছে ছিল না, ভয় হবে না?"

পিতা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "না লীলা, একজন পরম দয়ালু বন্ধু তোমার অতি নিকটে ছিলেন, কিন্তু তুমি ভয়ে তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে। তাঁহাকে স্মরণ করিলে মা! তোমার আর ভয় থাকিত না। তিনি সর্ব্বদা তোমার নিকটে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। পাঠক পাঠিকাগণ! এমন সুহৃৎ কে তা কি বুঝিতে পারিয়াছ?



ঠাকুরদাদার গল্প।

শিশির

(পূর্ব্বের পর)।

একদিন প্রাতঃকালে সকলে বাগানে বেড়াইতে গিয়া স্থির করিলেন যে সেদিনকার শিশিরের কথার বাকী টুকু আজ শেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। নবীন বাবুও উপস্থিত ছিলেন, সকলকে চারিদিকে বসাইয়া শিশিরের গল্প বলিতে লাগিলেন। প্রথমে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেদিনকার কথা সকলের মনে আছে কি না? সে কথা সকলেরই স্মরণ ছিল। সুতরাং নূতন কথা আরম্ভ হইল।

মন্মথ বলিল—"আজ বলিয়া দিন, দাদা বাবু, শীতকালে বেশী শীতল বলিয়া বায়ুতে বাষ্প কম থাকিলেও শিশির বেশী পড়ে কেন? এ কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে।"

নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন:—"আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বায়ু কখনই একেবারে বাষ্প-হীন হয় না। একটু না একটু জলীয় বাষ্প তাহাতে থাকেই থাকে। শীতকালেও সূর্য্যের উত্তাপ থাকে, ঐ উত্তাপে নদী, হ্রদ, সাগরাদি হইতে জল বাষ্প হইয়া উঠে। আরও একটা নিয়ম আছে যে বায়ু যত শুষ্ক অর্থাৎ বাষ্পহীন হয়, ততই উহার বাষ্প লইবার শক্তি বাড়ে। অর্থাৎ কোন জলাশয়ের উপর দিয়া যদি একটী অধিক বাষ্প-বিশিষ্ট বায়ু-প্রবাহ চলিয়া যায় তাহা হইলে উহা ঐ জলাশয় হইতে যে পরিমাণে জল বাষ্প করিয়া লইয়া যাইবে, শুষ্ক বায়ু-প্রবাহ তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেলে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল বাষ্প করিয়া লইয়া যাইবে। এ অতি সোজা কথা। কাজেই ঐ দুটী কারণে শীতকালের দিনের বেলায় বায়ুতে অনেকটা বাষ্প জমা হয়। এবং ঐ বায়ু সকালে ও রাত্রের অপেক্ষা কিছু গরম বলিয়া উহার বাষ্পটা জমিয়া তখন জল হইতে পারে না। কিন্তু যেই সূর্য্য অস্ত যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উপরের সমস্ত জিনিষ তাপগ্রহণ অপেক্ষা তাপ বিকীরণ বেশী করিতে থাকে, অমনি ঐ বায়ু তাহাদের গায়ে ঠেকিয়া ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। যেমন ঠাণ্ডা হয় অমনি ক্রমে ক্রমে দিনের বেলার সঞ্চিত বাষ্পগুলা সব জল হইয়া যায়। ঐ জল খুব ছোট ছোট কণার আকারে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায় ও নিকটস্থ পদার্থ সকলে লাগিতে থাকে। ইহারই নাম হিম। শীতকালের রাত্রে সমস্ত বাতাসটাই এই হিম পূর্ণ হইয়া যায়, সে সময়ে বাহিরে এলে গা বরফের মত কন্ কন্ করিতে থাকে। বুঝিতে পারিয়াছ?"

নলিন বলিয়া উঠিল "না দাদা বাবু! আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। আমাকে যতক্ষণ না ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন ততক্ষণ আমি আর বেশী বলিতে দিব না।"

নবীন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "কেন? এর ভিতর ত আর কোন শক্ত কথা নাই। শক্ত কথা যা কিছু সে দিনই বলিয়া দিয়াছি। তুমি ত সেদিন শুনিয়াছ যে, সকল দ্রব্যেরই "তাপ-গ্রাহিতা শক্তি" আছে, কোন গরম জিনিষের নিকট এলেই গরম হবে। আবার তেমনি সকল জিনিষেরই "তাপ-বিকীরণ শক্তি" আছে, উহা থাকাতে গরম জিনিষ মাত্রই নিজের গরম

চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। (নলিন,—"হাঁ শুনিয়াছি।") তবে আর কি? যতক্ষণ সূর্য্য মাথার উপর ছিল, পৃথিবী ও তাহার উপরিস্থ সব সামগ্রী গরম হইতেছিল বা তাপ গ্রহণ করিতেছিল। তখনই আবার তাপ বিকীরণও করিতেছিল, কিন্তু খরচ অপেক্ষা জমা বেশী ব'লে, অর্থাৎ বিকীরণ অপেক্ষা সূর্য্যের নিকট হইতে অধিক তাপ গ্রহণ করিতেছিল বলিয়া, দিনের বেলা সব জিনিষ গরম হইয়াছিল। এখন গরম পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া বাতাসও একটু গরম হইয়াছিল। সেই গরম বাতাসে উঠিয়া, জলাশয় সকলের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া ভাসিতেছিল। এই সব গেল দিনের বেলায়। সন্ধ্যা হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, পৃথিবীর গা ঠাণ্ডা হইল, তাহার উপরের জিনিষও সব ঠাণ্ডা হইয়া পড়িল। এই সব ঠাণ্ডা জিনিষের গায়ে বাষ্প-শুদ্ধ ঐ গরম বাতাস যেই লাগিতে লাগিল, অমনি উহার বাষ্প জল হইয়া ঐ সব ঠাণ্ডা জিনিষের গায়ে শিশির হইয়া পড়িল। এইরূপে শীতল হইতে হইতে যখন পৃথিবীর নিকটের সমস্ত বাষ্পটাই একেবারে শীতল হইয়া গেল, তখন সমস্ত বায়ুতে যত জলীয় বাষ্প ছিল তার অনেকটাই শীতল হিম হইয়া পড়িল। এবং ঐ হিমময় বায়ু যেখানে লাগিল অমনি খানিকটা হিম তাহার গায়ে রাখিয়া যাইতে লাগিল। এই রকমেই ঘাসে, পাতায়, জানালার কাচে, শ্লেটে, সব স্থানে সকালে উঠিয়া শিশির ফোঁটা ফোঁটা দেখা যায়। প্রথমে যখন শিশির জমিতে থাকে তখন কিন্তু একেবারে ঐ রকম ফোঁটা ফোঁটা হয় না। প্রথমে একটু সাদা দাগের মত পড়ে। ঠিক ভাল চাকু ছুরীর ফলাতে মুখ হইতে হাই দিলে যেমন সাদা হইয়া যায়, তেমনি প্রথমে খুব গুঁড়ি গুঁড়ি বাষ্প জমিতে আরম্ভ হয়, তার পর ক্রমে যত বেশী জমে তত কতকগুলা একত্র হইয়া শেষে বড় ফোঁটা হইয়া পড়ে। তা বোধ হয় তোমরাই কত দিন দেখিয়াছ, পাতার গায়ে সাদা দাগের মত সব শিশির কণা স্থির হইয়া রহিয়াছে, যেই তুমি নাড়িলে অমনি একটার পর আর একটা একত্র মিলিয়া বড় বড় ফোঁটা হইয়া পড়িল। না?—(সকলে "ঠিক্ ঠিক্।") এইরূপে শীতকালের রাত্রে শিশির পতন হয়। যথার্থ ধরিলে কিন্তু শিশির পড়ে না, বৃষ্টির মত ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া কখন পড়ে না। শিশির হয় বা জমে বলিলেই ঠিক বলা হয়। কেন না, বৃষ্টি যখন পড়ে, তখন কেবলই পড়ে, কোন দিকে চায় না, বাতাস ঠাণ্ডা হ'ল কি না, পৃথিবীর উপরকার জিনিষগুলা এখনও গরম আছে কি না, এ সব কিছুই দেখে না। উপরের বাতাস শীতল হইল, বাষ্প সব জমিয়া গেল, জলবিন্দু হইয়া ভারী হইল, আর অমনি হু হু করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। শিশির ত সে রকম নয়। শিশির উপরের বায়ুতে নয়, পৃথিবীর নিকটেরই বায়ুতে বাষ্প হইয়া এতক্ষণ ছিল, যেই দেখিল ক্রমে সুবিধা হইতেছে, সব জিনিষ ঠাণ্ডা হইতেছে, অমনি তাহাদেরই গায়ে লাগিয়া তাহাদেরই গায়ে জলবিন্দু হইয়া শিশির হয়। কাজেই তাহাকে আর শিশির পড়া বলা যায় না। শিশির বরং ঠাণ্ডা জিনিষের গায়ে বাতাস থেকে জমে বা হয় বলিলেই উচিত কথা বলা হয়।"

নলিন:—"হাঁ দাদা বাবু! এইবার আমি বেশ বুঝেছি। আর আমি যখন বুঝেছি, তখন আর কেহ বুঝিতে বাকী নাই।"

অমূল্য:—"আচ্ছা! শীতকালে যেদিন মেঘ

করে সেদিন রাত্রে কিছু শিশির হয় না কেন? আমার ঠোঁট ফেটে গিয়েছিল, মা বল্লেন যে শিশির দিলে ভাল হবে। আমি ভোরে উঠিয়া শিশির খুঁজিবার জন্য কত পাতা, ঘাস, ফুলগাছ ঘুরিলাম কোথাও দেখিতে পেলাম না। তখন মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন 'মেঘ হইলে শিশির পড়ে না।' আমি তখনই আপনাকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম। "কিন্তু মনে ছিল না, হঠাৎ আজ মনে পড়িল; বলিয়া দিন্ না?"

কিশোরী বলিল "তাইত? ঠিক কথা; শীতকালে যে দিন মেঘ করে সেদিন হিম পড়ে না বটে।" আর আর সকলেই এই কথায় সায় দিল। ঠাকুর দাদা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"যে দিন মেঘ হয় সে দিন যথার্থই কিছু শিশির জমিতে পায় না, কেন—বলিতেছি। বলিবার পূর্ব্বে কিন্তু আর একটা কথা বুঝান আবশ্যক। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সব কালেই যেদিন মেঘ হয় সেদিন বড় গরম হয়, তা বোধ হয় সকলেই জান। এক এক দিন এমনি গুমোট হয় যে প্রাণ আই ঢাই করিতে থাকে, মানুষকে অস্থির করিয়া তুলে। আবার যখন সন্ধ্যার সময় একটু বায়ু বহিয়া মেঘগুলাকে সরাইয়া দেয়, কিম্বা এক পশলা বৃষ্টি হইয়া মেঘ কাটিয়া যায়, তখন প্রাণ বাঁচে, ঠাণ্ডা হয়। কেমন? (সকলে "এ কে না জানে?") বেশ, কেন হয় বল দেখি? নিশ্চয়ই জান না। আমি বলিতেছি শুন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সব জিনিষ একই সময়ে তাপ গ্রহণ ও বিকীরণ উভয়ই করে। মনে আছে। পৃথিবী ও সূর্য্যের নিকট হইতে দিনের বেলা তাপ গ্রহণ করিতে থাকে, আবার তখনই খানিক খানিক তাপ বিকীরণও করিতে থাকে। কেমন করিয়া জানিতে পারি? আচ্ছা, মনে কর এই গ্রহণ হইতে বিকীরণের তাপ বাদ দিলে যা বাকী থাকে দিনের বেলা আমরা সেই টুকুই অনুভব করিতে পাই; যে টুকু চলিয়া যায় সে টুকুও অনুভব করি না, আর যে তাপটা সূর্য্য হইতে আসে তারও সবটা পাই না। বিকীর্ণ হইয়া যেটা বাকী থাকে তাহাই আমরা পাই। বেশ, এখন কোন কারণে যদি ঐ বিকীরণ বন্ধ করা যায়, তবেই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত সমুদায় তাপই অনুভব করা যাইবে। এখানেও ঠিক তাই হয়। রোজ আমরা দেখিতে পাই সূর্য্য হইতে গৃহীত তাপের খানিকটা বিকীর্ণ হইয়া আকাশে ছড়াইয়া যায়, পৃথিবী থেকে উড়ে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যায়, তাই গরম কম বোধ হয়। মেঘ হইলে ঐ বিকীরণ হওয়ার পক্ষে বাধা পড়ে, উপরে ছাতের মত মেঘ স্তূপে স্তূপে রহিয়াছে তা ভেদ করিয়া পৃথিবীর বিকীর্ণ তেজ আকাশে পলাইয়া যাইতে পারেনা, এজন্য সেখান থেকে আবার প্রতিফলিত হইয়া অর্থাৎ ঠিকরিয়া পৃথিবীর দিকে আসে, কাজেই পৃথিবীর নিকটের বায়ু খুব গরম বোধ হয়। বুঝিলে? এই জন্য দুইটী কারণে মেঘ হইলে বায়ু গরম থাকে:—১মতঃ, বিকীরণ ভাল করিয়া হইতে পায় না, ২য়তঃ, মেঘের দিকে যে উত্তাপটা উঠিয়াছিল সেটা আবার প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীর দিকেই ফিরিয়া আসে। এই দুইটী কারণে মেঘলা রাত্রে পৃথিবী শীতল হইতে পায়না। কাজেই তাহার নিকটের বায়ুও শীতল হয় না, কোন জিনিষও শীতল হয় না। এই জন্য ঐ বায়ুর বাষ্প বাষ্পই থাকিয়া যায়, শিশির হইতে পায় না, ঐ জন্য গাছের তলায় বা ঘরের ছায়ার মধ্যেও শিশির হয় না। বুঝিলে? (সকলেই "হাঁ")

ঐরূপে যেদিন জোরে হাওয়া হয় সে দিনও শিশির ভাল জমে না। নানা স্থানের গরম বায়ু আসিয়া পড়াতে বাতাসটা খুব ঠাণ্ডা হইতে পায় না। আর বায়ুর চলাচল হওয়ার জন্যও উহা শীতল হয় না। কাজেই ভাল রকম শিশির জমে না, যাও একটুক আধটুক জমে তাও উড়িয়া যায়।

শিশির জমিবার নিয়ম এখন বেশ্ শিখিলে। আর একটী কথা বলিয়া অদ্য বাড়ী যাইব। তোমরা দেখিয়াছ যে ঘাঁস, পাতা প্রভৃতি কতক গুলি জিনিষে শিশির অন্য কতকগুলি জিনিষের চেয়ে বেশী জমে, এর কারণ কি?—না, পূর্ব্বে বলিয়াছি বিকীরণ শক্তি সকলের সমান নয়। যে সকল বস্তু শীঘ্র তাপ বাহির করিয়া শীতল হইতে পারে তাহারাই বেশী শিশির পায়। ঘাস, পাতা, কাচ, তুলা, পশম (যেমন চুল, কম্বল ইত্যাদি), লোহার বার প্রভৃতি সামগ্রী রাত্রে বাহিরে থাকিলে উহাদিগের গায় যত শিশির জমে, অন্য জিনিষের গায় তত জমে না। মোট নিয়মই এই যে, যে দ্রব্য যত শীঘ্র শীঘ্র গরম তাড়াইয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে তাহাতে তত পরিমাণে শিশির জমে।"

সকলে :—"খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম দাদাবাবু।" নবীন বাবু বলিলেন "এই কথা বলিতে বলিতে একটা ভাল কথা মনে পড়িল। শিশির যেমন নিঃশব্দে স্বর্গ থেকে পড়ে, মানুষের উপরে তেমনি জ্ঞান ও ধর্ম্ম স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর নিঃশব্দে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু শিশির যেমন গরম না তাড়াইলে জমে না, মানুষও তেমনি যত দিন নিজের অহঙ্কার রূপ তাপকে তাড়াইয়া দিয়া বিনয়ী, শান্ত ও নম্র না হয়, ততদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মের শিশির তার প্রাণে জমাইতে পারে না। এই উপদেশ সর্ব্বদা মনে করিয়া অহঙ্কারের তেজ কমাইবে আর নম্র হইয়া বিনয়ী হইয়া কেবল শিখিতে চেষ্টা করিবে। তবে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইয়া জগতের উপকার করিতে পারিবে। চল আজ বাড়ী যাই।"



৺ তারকনাথ প্রামাণিক।



বালিকাগণ! উপরে যাঁহার ছবি দেখিতেছ, ইহাঁর বিষয়ে আজ তোমাদিগকে কিছু বলিব। অল্প লেখা পড়া শিখিয়া, অল্প বয়সে বিষয় কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া, শরীরের শ্রম, বুদ্ধির জোর, কাজে মনোযোগ, ও ধর্ম্মপথে মতির দ্বারা লোকে নিজের

অবস্থার কিরূপ উন্নতি করিতে পারে, যদি দেখিতে চাও, তবে এই সাধু ব্যক্তির জীবন চরিত মনোযোগ দিয়া পড়।

ইহাঁর নাম তারকনাথ প্রামাণিক। কলিকাতায় ইহাঁর নাম জানে না এমন লোকই নাই। ইনি জাতিতে কাঁসারি ছিলেন। সিমলায় কাঁসারি পাড়াতে বাড়ী। ১২২৩ সালের ৫ই আশ্বিন ইহাঁর জন্ম হয়, এবং ১২৯১ সালের ৭ই চৈত্র ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। ১২ বার বৎসর বয়সের সময় ইনি ইহাঁর খুড়ার একটি বাসনের দোকানে কর্ম্ম আরম্ভ করেন। বার বৎসরের পূর্ব্বে কত লেখা পড়া জানা সম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পার। যাহারা শ্রম করিয়া খায়, এবং যাহাদের ছেলে পিলেকে শ্রম করিয়া খাইতে হইবে, তাহারা বড় বড় বাবুদের মত ছেলে-পিলেকে ভাল রকম লেখা পড়া শিখাইতে পারে না। তারকনাথকেও বার বৎসর বয়সে নিজের হাতে শ্রম করিয়া বাসন পিটিয়া খাইতে হইয়াছিল। সচরাচর দেখা যায় যে এত অল্প বয়সে, ভাল রকম লেখা পড়া না শিখিয়া, কাজ কর্ম্মে লাগিলে অনেক ছেলে প্রায় কুসঙ্গে পড়িয়া বয়ে যায়; কাজে তাহাদের মনোযোগ থাকে না; অল্প বয়সে তামাক, গাঁজা বা মদ খাইতে শিখিয়া একেবারে অপদার্থ হইয়া পড়ে, কিন্তু তারকনাথের বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে এই সকল দোষে তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই। তিনি যে শ্রমে কাতর ছিলেন না, এবং তাঁহার যে কোন প্রকার অপব্যয় ছিল না, তাহা তাঁহার উন্নতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। তিনি দিন দিন নিজ ব্যবসায়ে এমন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন যে ১২৫৯ সালে হাবড়ার একটী "ডক" অর্থাৎ "জাহাজ মেরামতি কারখানা" কিনিলেন। তাঁহার হাতে ঐ ডকটীর অবস্থা দিন দিন ভাল হইতে লাগিল। তাঁহার বিলক্ষণ আয় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনি ধনী হইতে লাগিলেন। ক্রমে কলিকাতায় বড় বাজারে একটী বাসনের দোকান করিলেন এবং আরও অনেক দোকানের অংশীদার হইলেন। ক্রমে দশ দিক হইতে টাকা আসিতে লাগিল।

তারকনাথের ধন বাড়িতে লাগিল সেই সঙ্গে দানশক্তিও প্রকাশ পাইতে লাগিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে ধন হইলে লোকের ধর্ম্মে মতি থাকে না, কত প্রকার কুপথে মতি হয়, কত কুসঙ্গী যোটে, কত বদ খেয়ালি উপস্থিত হয়, ধনের গরমীতে মন মত্ত হয়। কিন্তু তারকনাথ প্রামাণিকের এ সব দোষ ঘটে নাই। তিনি ধনী হইয়াও ধর্ম্ম-ভীরু ও বিনীত লোক ছিলেন। এটি তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন যে জগদীশ্বর ধন দিয়াছেন পরোপকারের জন্য। এই জন্য তিনি সকল ক্রিয়া কর্ম্মে হাজার হাজার গরিব লোককে দান করিতেন। এমন দিন প্রায় যাইত না যে দিন তাঁহার দ্বারে দলে দলে গরিব-লোক অন্ন পাইত না;—প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে ইহার অটল আস্থা ছিল এবং ইহাঁর দান ধ্যান ও সেকেলে লোকের মত ছিল। সকল দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রেই এই উপদেশ দিয়াছে যে গোপনে দান করিবে—নাম কিনিবার ইচ্ছায় দান করিলে সে দানের মূল্য থাকে না; তাহা অতি ছোট কাজ। আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে—"দত্ত্বা ন পরিকীর্ত্তয়েৎ"—দান করিয়া তাহা বলিবে না। খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল পড়িলে দেখা যায় যে—যীশু তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেছেন যে "তোমরা যখন দান করিবে, তখন তোমাদের বামহস্ত যেন

জানে না যে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত কি কাজ করিল," এত গোপনে পরোপকার করিতে হইবে। সকল শাস্ত্রের, সকল সাধুর এই উপদেশ। কিন্তু কত লোকে এই মহা উপদেশ ভুলিয়া গিয়া সুখ্যাতি পাইবার জন্য দান ধ্যান করে; দশজনে প্রশংসা করিবে এইজন্য লোককে দেখাইয়া পরোপকার করে! আবার কতজন একটু লোকের উপকার করিয়া নিজের মুখে দেমাক করিয়া বেড়ায়,—লোকের কাছে বাহাদুরী করে, উপকৃত ব্যক্তি একটু মনের অনভিমত কাজ করিলে তাহাকে লোকের কাছে কৃতঘ্ন বলিয়া নিজের কৃত উপকারকে বাড়াইয়া বলে। আমি এমন করিয়াছি, তেমন করিয়াছি, আমি উহাকে খাইতে পরিতে দিয়াছি, আমি উহাকে রক্ষা করিয়াছি, এই সকল বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা করে। এ সকল ভাল মনের কর্ম্ম নয়, ইহাতে নিকৃষ্ট মনই প্রকাশ পায়। তারকনাথের মন এত নীচ ছিল না। তাঁহার বিনয় এত অধিক ছিল যে কেহ প্রশংসা করিলে বড় লজ্জা পাইতেন। যখন দান করিতেন, এমন গোপনে করিতেন যে বাড়ীর লোকেও জানিতে পারিত না। কর্ম্মচারিদের হাত দিয়া দান করিলে পাছে তাহারা জানিতে পারে, এজন্য যে কিছু দান করিতেন, তাহা প্রায় নিজের হাতে করিতেন। যখন কোন লোক আসিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইত, এবং তাঁহার মনে কিছু দিবার ইচ্ছা হইত তখন তিনি কি দিবেন তাহা মনে মনে স্থির করিতেন, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়াছে তাহাকে কিছু বলিতেন না। গোপনে টাকা লইয়া, তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন, এবং আস্তে আস্তে তাহার হাতখানি পশ্চাতদিকে লইয়া, টাকাগুলি হাতে গুঁজিয়া দিয়া, তাহার হাতখানি মুঠা করিয়া দিতেন ও বলিতেন "যৎকিঞ্চিৎ হইল এখানে দেখিবেন না" সুতরাং সে ব্যক্তি গণিয়া দেখিতে পারিত না, এবং তাঁহার বাড়ী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেও জানিতে পারিত না যে কত পাইল।

এইরূপে কত লোক যে তাঁহার সাহায্য পাইয়াছে, কত লোকে যে তাঁহার অর্থে মানুষ হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহার অনেক দানের কথা তাঁহার মৃত্যুর পরে জানিতে পারা গিয়াছে। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে স্কুলের গরিব ছাত্রদের বেতন দিবার জন্য তাঁহার মাসে ১৫০ টাকা ব্যয় হইত। একবার একটী গ্রামে বড় জল কষ্ট হওয়াতে, একজন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় কত খরচ লাগিবে।" ভদ্রলোকটি একটী পুষ্করিণী খননের খরচের অনুমান করিয়া কয়েক শত টাকার হিসাব দিলেন। তারকনাথ হাসিয়া বলিলেন—"না মহাশয় আপনি যত টাকা বলিলেন তাহাতে হইবে না। পুকুর কাটিতে এত, ঘাট বাঁধাইতে এত, প্রতিষ্ঠা করিতে এত, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে এত" এই বলিয়া নিজে একটী খরচের আনুমানিক হিসাব করিলেন এবং একদিন লুকাইয়া ভদ্রলোকটীকে সেই সমুদায় টাকা দিলেন।

তাঁহার দান এইরূপ ছিল। আমরা আগেই বলিয়াছি তাঁহার দান সেকেলে লোকের মত ছিল। এরূপ দানের একটা দোষ এই, অনেক দুষ্ট লোক গরিব সাজিয়া ঠকাইয়া লয়, অনেক অলস লোক যাহারা খাটিয়া খাইলে সুখে চালাইতে পারিত, তাহারা ভিক্ষা করিয়া সেই টাকায় বদমায়েসি করে। তারকনাথের দানে এ দোষ যে ঘটিত না এরূপ বলা যায় না। দেশের কত

অভাব আছে, তাহা নিবারণের জন্য কত সভা হইতেছে, সে সকল প্রকাশ্য সভাতে তাঁহার বিশেষ দান ছিল না। পাছে লোকে জানিতে পারে এই ভয়েই বোধ হয় দিতেন না। কিন্তু তিনি সাবধান হইলেও তাঁহার সুখ্যাতি দেশ বিদেশে গিয়াছিল। এমন কি ১৮৭৭ সালের দিল্লী দরবারের সময় লর্ড লিটন বাহাদুর তাঁহার বদান্যতার সুখ্যাতি করিয়া এক প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনের শেষ ৭।৮ বৎসর বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া, কেবল ধর্ম্ম-চিন্তায় সময় যাপন করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল পূজা, আহ্নিক, শাস্ত্রপাঠ, হরি সংকীর্ত্তনে কাল কাটাইতেন; এবং যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের সহিত শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া আনন্দ-লাভ করিতেন।

এরূপ ধর্ম্ম-পরায়ণ, সত্য-নিষ্ঠ, বিনয়ী লোক দেশের অলঙ্কার স্বরূপ। সেকেলে লোকদিগের মধ্যে এইরূপ সাধুলোক অনেক পাওয়া যাইত। আমরা নূতন শিক্ষা পাইয়া যদি এই সকল সদ্‌গুণ হারাই, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি? যাঁহার বিদ্যা আছে অথচ অভিমান নাই; ধন আছে অথচ মনে অহঙ্কার নাই, বিষয়-কর্ম্ম আছে অথচ অসত্য ব্যবহার নাই; যাঁহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ, দুঃখীর প্রতি দয়া, এরূপ ব্যক্তিকে আমরা প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করি।

তারকনাথের আর একটী বড় সদ্‌গুণ ছিল। তিনি অতি উদার ছিলেন। পরের দোষ দেখা-ইতে ভাল বাসিতেন না। একদিন তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া দুইজন ভদ্রলোক পরের দোষ-গুণের বিষয় বিচার করিতেছিলেন, তিনি বাহির হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন,—"দেখুন মহাশয়। কোন ব্যক্তির গুণের ভাগ কত, দোষের ভাগ কত, এ বিচার আদালতের বিচারক করিবেন, আমরা যখন পরের কথা কই, তখন তাঁহার গুণের আলোচনা করা ভাল, দোষের আলোচনাতে আমাদের লাভ কি?" প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিল, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁহার ভাল ভাব ছিল না, তথাপি তিনি এমনই উদার ছিলেন যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কথা হই-লেই বলিতেন,—"আমার ত বোধ হয় তিনি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য অপেক্ষা বড় পণ্ডিত ছিলেন। কারণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এক প্রকার শাস্ত্রই পড়িয়া-ছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায় সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন।"—

এইরূপে সেই সাধু-প্রকৃতি সদাশয় পুরুষ যথা-সাধ্য নিজের ও অপরের কল্যাণ-সাধন করিয়া বিগত চৈত্র মাসে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া-ছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে কলিকাতার ভূষণ-স্বরূপ একটী লোক আমরা হারাইয়াছি। এরূপ সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট লোক যে দেশে অধিক জন্মে সেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়।*

* আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি-তেছি যে ৺তারকনাথ প্রামাণিকের জীবনের ঘটনাবলী যাহা লেখা হইল তাহা সমুদায়ই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ প্রামা-নিক মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।



গাধা-সিংহ।



সে সময়ে গাধাও কথা কহিতে পারিত। সে কত কি ভাবিত, আমাদেব অনেকেব মত বুদ্ধি করিয়া নূতন ফিকিরে আপনার ঘাস জলের যোগাড় করিত। একদিন গাধা মহাশয় এক চাষার কলাইএর ক্ষেতে কিছু যোগাড়ের আশায় ঢুকিয়াছিলেন। চাষাটা কিছু নির্দ্দয় লোক, সে লাঠি মারিয়া আমাদের গর্দ্দভ-চন্দ্রকে বাহির করিয়া দিল।

দুই এক ঘা চড় চাপড় খাইয়া অনেক ছেলের বুদ্ধি যেমন সূক্ষ্ম হইয়া যায়, আমাদের গাধা-রামেরও লাঠি খাইয়া একটা নূতন বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল। সে একটা সিংহের চামড়ায় আপনার শরীরটা ঢাকিয়া ফের সেই কলাইএর ক্ষেতে দেখা দিল। চাষা দেখিল একটা সিংহ আসিয়াছে, সে প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। গাধার মজা আর দেখে কে। বিলক্ষণ রকম উদর পূরণ করিয়া গাধারাম পশুদের দলে আসিলেন এবং লাফালাফি, ঝাপাঝাপি করিয়া তিনি যে সিংহ, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। নির্ব্বোধ পশুরা গাধাকে গাধা বলিয়া চিনিতে

পাবিল না। ঘোড়া, গরু, মেষ প্রভৃতি যত পশু সকলই দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। অবশেষে এক খেঁকশিয়াল সেইখানে আসিয়া গাধার খুর দেখিয়া এবং তাহার সুমিষ্ট গলার স্বর শুনিয়া তাহাকে গাধা বলিয়া চিনিয়া ফেলিল। তখন গাধারামসিংহের সিংহত্ব আর কিছুই রহিল না। সকলেই তাহাকে গাধার মত ব্যবহার করিতে লাগিল।

গল্পটা অনেক কালের; তবে উপদেশটী ভাল। যে গাধা তাহার গাধা থাকাই উচিত। সে যদি সিংহের গুণ না পাইয়া সিংহ সাজিতে যায় তবে তাহার এইরূপই দশ জনের নিকট হাসির পাত্র হইতে হয়। আজ কাল দেখিতে পাই অনেক ছেলে তাহাদের ছেলেত্ব ভুলিয়া গিয়া বুড়োর মত কথা কহিতে ভাল বাসে। যে ৫ম বা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বালক আপনার কতটা বিদ্যা, বুদ্ধি তাহা না বুঝিতে পারিয়া তাহার গুরু জনের মত ধর্ম্মের কথা বা অন্যান্য বড় কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে যায়, সেই ছেলেকে একজন 'গাধা-সিংহ' বলিয়া জানিও। যাহার যতটুকু পুঁজি আমরা তাহার কাছে তত-টুকুই দেখিতে ইচ্ছা করি। আমরা বালকের নিকট এই চাই, যে তিনি পড়া শুনায় যত্নবান হইবেন, সৎ এবং লোক-প্রিয় হইবেন, শারীরিক শ্রম করিয়া শরীরকে সুস্থ রাখিবেন এবং পিতা-মাতার বাধ্য হইয়া সুপুত্রের কাজ করিবেন। বালি-কার নিকট এই চাই যে,তিনি নানাবিধ গৃহ-কর্ম্মে সুনিপুণা, সুশীলা ও দয়াবতী, বিদ্যা উপার্জ্জনে যত্নশীলা এবং আত্মীয়-স্বজনের অনুগতা হইবেন। ইহা ছাড়া যদি দেখিতে পাই যে একটী ছোট ছেলে অথবা মেয়ে এমন সকল কথা বলে অথবা এমন,সকল বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করে যাহার কিছুই সে বুঝে না, তাহা হইলেই জানিলাম যে সেই ছেলে অথবা মেয়ে বিগড়িয়া গিয়াছে। সে ছিল গাধা এখন সাজিতে চায় সিংহ।



সত্যের জয়।

বিষ্ণুপুর খাঁটি পাড়া গাঁ। সেখানে রেল নাই, ঘোড়ার গাড়ীটী পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। এই ছট্ ফটে গরমের সময় বরফ পাওয়া যায় না, লেমনেড্ পাওয়া যায় না, কলের জল পর্য্যন্ত নাই। সেখানকার লোককে সহরের লোকে অজ্ পাড়াগেঁয়ে বলে ঠাট্টা করে। কিন্তু তা হলেও তারা আমাদের মত খায় পরে, আমাদের মত কথা বলে, লেখা পড়া শেখে, ঘরে অতিথি এলে আদর করে তাকে খেতে দেয়। রাত্রিতে হঠাৎ যদি কোন পথিক যায়গা না পেয়ে গ্রামের মধ্যে আসে ভদ্র লোকেরা আদর করে তাকে আপনার বাড়ীতে থাক্‌তে দেন। তার সঙ্গে আলাপ করেন। পাড়াগাঁয়ের লোকের এই গুণটী খুব। সহরে এটা বড় দেখা যায় না।

বিষ্ণুপুর গ্রাম খানি বড় ছোট নয়। সব-শুদ্ধ হাজার ঘর ভদ্র লোকের বাস। ছোট লোকও প্রায় চার পাঁচ শত ঘর হবে। ভদ্র লোকদের মধ্যে দামোদর মণ্ডল সবচেয়ে বড়। দামোদর জাতে চাষা। দামোদর নিজে হাতে লাঙ্গল চষে, ব্যবসা করে, মাথায় মোট

করে অনেক টাকা করেছেন। বড় অমায়িক লোক। পরের উপকার করিবার জন্য সদা ব্যস্ত অথচ তাঁর কথা কখনও খবরের কাগজে বাহির হয় না। সদাই হরিনাম করেন। পূজা বা পাঁঠা বলি হয় না কিন্তু দীন দুঃখীদের দেওয়া থোয়া বার মাসই চলে—তার কামাই নাই। গ্রামখানি দামোদরের তালুক। গ্রামের ছোট লোকেরা তাঁর ছেলের মত। বাইরের একখানি ঘরে তিনি বসে থাকেন, আর গাঁয়ের যত ছোট লোক সবাই এসে তাঁর কাছে বসে কথা বলে, নালিশ করে। দামোদরকে তারা বাপের মত দেখে। গ্রামের আর আর বামুন, কায়েত, বৈদ্য-দের সঙ্গেও দামোদরের বেশ ভাব আছে। হবেই না বা কেন—যে ভাল হয় তার কেউ শত্রু থাকে না!

দামোদরের একটী ছেলে। ছেলেটী কলিকাতায় এম, এ, পাস করিয়াছেন। বাড়ীতেই থাকেন। তাঁর নাম প্রসন্ন বাবু। প্রসন্ন বাবুর পিতার অনেক টাকা পয়সা কাজেই তিনি আর চাক্‌রি না করে বাড়ীতেই বাবার বিষয় এবং ব্যবসায় যোগ দিয়ে টাকা রোজগার করেন। ছেলে যা ভাল বোঝেন তাহাই করেন, বাপ কোনও কাজে বাধা দেন না। ছেলেও বাবার মত না নিয়ে কাজ করেন না। ছেলের স্বভাব বাপের মত খুব সৎ। কিন্তু তা হলেও ছেলের একটু খরচ বেড়েছে। দামোদর কাপড় পরেন হাঁটুর নীচে নামে না, কিন্তু প্রসন্ন বাবুর রেলীর উনপঞ্চাশ দরকার হয়। কর্ত্তার গায়ে জামা প্রায়ই থাকে না,কেবল কাঁধে এক খানি দশ আনা দামের বিলাতি উড়ানি; কিন্তু ছেলের গায়ে জামা, ফরেস ডাঙ্গার উড়ানি। প্রসন্ন বাবু বাবাকে ভাল কাপড়চোপড় পর্ত্তে খুব অনুরোধ করেন কিন্তু কর্ত্তা বলেন "আর বাবা। আমার তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন তুমি ভাল পর। আমি এই রকম করে কাল কাটিয়ে দিই। বরং আমাকে যে ভাল কাপড় দেবে সে কোনও গরিবকে দাও"।

প্রসন্ন বাবুর এখন নজর বড় হয়েছিল! তিনি গাঁয়ের ভিতর একটি বেশ পরিষ্কার পথ করে দিলেন। একটি ছোট খাট ইংরেজি-বাঙ্গলা স্কুল করিলেন। একটি ছোট ডাক্তার আনিয়ে ডাক্তারখানা করিলেন। একটী ডাক্ বাক্স বসাইলেন। এ সকলই বাপের পরামর্শে। গ্রামের লোক বড় খুসী। বামুন গুলো দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে লাগ্‌ল।

যাক্ আমরা এত ক্ষণ অপর কথা বলিলাম। এখন আসল কথা বলা যাক্। আগেই বলেছি বিষ্ণুপুরে প্রায় চার পাঁচশ ঘর ছোট লোকের বাস। এদের মধ্যে চাঁড়ালই বেশী। গদা চাঁড়াল (চণ্ডাল) তাদের মধ্যে একজন। গদা প্রসন্ন বাবুর বাপের সখের পাইক্। গদাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তোমার নাম কি? গদা বুক্ ফুলিয়ে বলে "আমার নাম গদাধর সর্দ্দার।" কিন্তু আমরা কি করব বুড় কর্ত্তা দামোদর ঘোষ তাকে "গদা" বলেই ডাকেন। আমরা তাঁর কাছেই শিখেছি। যদিও গদা নামটা শুন্‌তে খারাপ লাগে তবু,"গদা" বলে ডাক্‌লেই গদাধর অমনি "আজ্ঞে" বলে উত্তর দেয়।

গদার গড়ন খুব মোটা সোটা—খুব মজবুত। মাথা খুব বড়—মাথায় এক মাথা বাউরি চুল—তেলে মাথাটী কুচ্‌কুচে। খুব কোঁকড়া চুল। গদা ভারী চুলের গরব করে। রং মুস্‌কো কালো। অন্ধকার রাত্রিতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। গাঁয়ের ভদ্রলোকের ঘরের বুড়ীরা বলেন "বাপ্‌রে গুদার

গড়ন ত নয়—যেন যমের দূত!" গদা লম্বায় ঝাড়া চার হাত। দাঁতে মিসি লাগান। সাম্‌নের উপরের দুটী দাঁতে ভোম্‌রার দাগ কাটা। এই হল গদার চেহারা।

গদা খুব লাঠিয়াল—সে দেশে তার মতন লাঠি খেলোয়াড় দেখা যেত না। সবাই তাকে "ওস্তাদ" বল্‌ত। সে কিন্তু লোক ভাল নয়। বুড় মনিব দামোদর ঘোষের খুব সখের চাকর হলেও গদাধর ডাকাত। মনিবের খুব বিশ্বাসী। গদা বল্‌ত "আমি যতদিন থাক্‌ব মনিবের এক-গাছি কুট চুরি যাবে না।" কথাটাও খুব সত্য। গদা মনিবের খুব বিশ্বাসী, কিন্তু সে ডাকাতি করে। সে বৈশেখ, জষ্টি মাসের অন্ধকার রাত্রিতে চুপি চুপি কোথায় চলে যেত আবার রাত্রিতেই আস্‌ত। কর্ত্তা বুঝ্‌তে পার্ত্তেন, তাই অনেক বোঝাতেন কিন্তু তবু ডাকাতি করা ছাড়্‌তে পার্ত্তনা। প্রসন্ন বাবু কিছু জানিতেন না আর কেহই জানিতে পারিত না। কিন্তু কর্ত্তা গদার জন্য বড়ই ভাবেন। ভাল করে খান না, কথা বলেন না। প্রাণে যেন কেমন একটা খুঁৎ খুঁতুনি ধরে গেল। একদিন ক্রমাগত গদাকে বলেন, বোঝান। গদার একটা গুণ ছিল, গদা খুব সরল। কর্ত্তা যখন তাকে সব বল্‌তেন, সে বলিত "আমার খুব ইচ্ছা হয় যে ভাল হই, কিন্তু কেমন আমার খেলারোগ, আমি ডাকাতি করে কিছু নিই না; কেবল যাই খেলাবার জন্যে।" কর্ত্তা বড়ই ত দুঃখিত হলেন। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে বলিলেন "গদা আমি তোকে বড় ভাল বাসি, তোকে আমি হয় ভাল করব না হয় আমি নিজে মরব!" কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যে গদা কথা শুনে চম্‌কে উঠিল। তখন সে বলিল "আপনি আমাকে কি কর্ত্তে বলেন বলুন, কিন্তু আমি বোধ হয় ভাল হতে পার্‌ব না!" কর্ত্তা অনেক ভেবে চিন্তে বলিলেন "তুই ডাকাতি কর্‌, কিন্তু কোনও জিনিস্ নিবি না, আর সকলের কাছে সত্য কথা বল্‌বি।" গদা এই কথা শুনে বড়ই খুসী হয়ে বলে উঠিল "এই হলেইত আপনি রাজী।" কর্ত্তা বলিলেন "হাঁ"। গদা মনে মনে খুব খুসী হইল। সে মনে করিলে "জিনিস্ ত নিই না—তবে সত্যি কথা বল্‌ব, তা আমি ত ডাকাত বলে আর কেউ জানে না, এক মনিবরা জানেন। গাঁয়ের লোক জানেও না, তারা আমাকে জিজ্ঞাসাও কর্‌বে না।" এই ভাবিয়া গদা একদিন লাঠি ঘাড়ে করে রাত্রিতে যাইতেছে এমন সময় একজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল "কি গদাধর এত রাত্রিতে কোথায় যাও?" গদা এখন বিষম মুস্কিলে পড়িল, মিথ্যা কথাও বলিতে পারে না; সত্য বলাও মুস্কিল, কাজেই ফিরে আস্‌তে হল। এইরূপ আরও দুই এক দিন হ'ল, তখন দেখিল এক সত্য বল্‌তে গিয়েই সে ধরা পড়ে গিয়েছে। গদা এখন থেকে ডাকাতি ছাড়িল।

বুড় কর্ত্তা কেমন চতুর। এক সত্য কথা বলিতে শিখাইয়া গদার চির অভ্যস্ত ডাকাতি ছাড়াইয়া দিলেন।

সত্য কথা সমুদয় সৎ কার্য্যের মূল। সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে শিখিলেই কোন প্রকার অসৎ কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

স্থানাভাবে এবারে গত বারের ধাঁধার উত্তর এবং নূতন ধাঁধা দেওয়া গেল না।



জুন, ১৮৮৫। জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।

ঠাকুরদাদার গল্প।

আগ্নেয়গিরি।

অনেক পরে একদিন নবীন বাবু ও তাঁহার বালকগণ আবার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। তথায় বসিয়া নানা বিষয়ে কথা-বার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময়ে একজন লোক কতক-গুলি তুব্‌ড়ী-বাজী লইয়া উপস্থিত হইল ও বলিল "বাবু! খুব ভাল তুব্‌ড়ী, নেবেন? আট পয়সা ক'রে একটা।" নলিন চক্ষু ক্ষেপে দাঁড়ালেন—চারিটা চাই। তুব্‌ড়ী চারিটা কেনা হইল। ফেরীওয়ালা চলিয়া গেলে নবীন বাবু বলিলেন "এই তুব্‌ড়ীতে যখন আগুণ দেওয়া হয় তখন কি রকম হয় বল দেখি, নলিন?" নলিন অমনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা তুব্‌ড়ী লইয়া মাটিতে রাখিল, হাতে একটা বড় গোছের কঞ্চি লইয়া যেরূপ ভাব ভঙ্গী করিয়া আগুণ দিবার মত করিল, দেখিয়া সকলের মহা হাসি পড়িয়া গেল। হাসি থামিলে নলিন বাবু বলিতে লাগিলেন "এই—যখন—এই রকম করে—আগুণ দেব,—তখন অমনি ফুর ফুর—ফুর ফুর ক'রে সব বেরবে, আর কেমন মজা হবে!" সকলে নলিনের আনন্দ দেখে খুসী হইলেন। নবীন বাবু তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে পার বল দেখি, প্রকৃতির স্বাভাবিক তুব্‌ড়ী-বাজী কোথায় হয়?" কিশোরী বলিল "আমরা বইতে পড়িয়াছি আগ্নেয়গিরিতে হয়।" নলিন বলিয়া উঠিল "তবে আমি সে আগ্নেয়গিরি কিন্‌বো?" —এই সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠিলেন।— তখন সে চারিদিক চেয়ে ঠাকুরদাদার হাত ধ'রে বলিল "না দাদা। তবে সে কি রকম আমায় বুঝায়ে দিতে হবে।"

নবীন বাবু আরম্ভ করিলেন। "বহু দিন হইল আমি তোমাদের পর্ব্বতের কথা বলিয়াছিলাম। আগ্নেয়গিরি এক রকম পর্ব্বত, তবে পর্ব্বত অপেক্ষা ছোট, তাহাকে বরং পাহাড় বলা যায়। অনেক রকমের আগ্নেয়গিরি দেখা যায়, পর্ব্বতের গায়ে, বা আলাদা, দ্বীপে বা সমুদ্রের জলের ভিতর। সাধারণতঃ তাহারা প্রায়ই অধিক উচ্চ হয় না। কাস্পিয়ান সাগরের চারিদিকে যে সকল আগ্নেয়গিরি দেখা যায় তাহারা দেখিতে অতি ছোট, এমন কি সামান্য উচ্চ ঢিবি কবা কাদা মনে হয়। আবার ওদিকে আণ্ডিস্ পর্ব্বতের মধ্যে কটোপাক্সী নামক গিরি ১৮,৮৮৭ ফুট অর্থাৎ ৩½ সাড়ে তিন মাইলেরও বেশী উচ্চ। ইহাদের আকার-



প্রায়ই গোল হইয়া থাকে। দেখিতে ঠিক তুবড়ীরই মতন। (ছবি দেখ।) তাহার চূড়ার উপরে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর থাকে, এবং ঐ গহ্বরের তলা হইতে পৃথিবীর গর্ভ পর্য্যন্ত একটী ভয়ানক নল থাকে।"

গণেন্দ্র—"হাঁ, আমরা পড়িয়াছি ঐ গহ্বরের নাম crater ক্রেটার আর ঐ নলের নাম shaft সাফ্‌ট্‌। নয়?"

নবীন বাবু বলিলেন—"ঠিক কথা। নলের ভিতর হইতে জলন্ত রক্তবর্ণের আভা বাহির হয়; ঐ আলো প্রায় সর্ব্বদাই আগ্নেয় পর্ব্বতের চূড়ার উপর দেখা যায়। আর ঐ নল দিয়া সর্ব্বক্ষণ এঞ্জিনের মত ধূঁয়া বাহির হইতে দেখা যায়। কাজেই, ভিতরে যার এমন ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড দিন রা'ত গম্ গম্ কর্‌ছে, তার উপর দিয়া ধুম বা আলো যে বাহির হবে এ আশ্চর্য্য কি?"

মন্মথ—"ওঃ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! আচ্ছা, দাদাবাবু! সেখানে কেও যেতে পারে?"

নবীন বাবু—"পারে বৈ কি? আমার এক বন্ধু তিনবার বিখ্যাত ভিসুভিয়স্ নামক আগ্নেয়গিরি দেখিতে যান। তিনি বলেন প্রথমতঃ পাহাড়ের তলায় বেশ্ সুন্দর সুন্দর গাছ ও দ্রাক্ষালতার ঝোপ, তাহার মধ্যে ছোট ছোট কুটীর সকল অতিশয় শোভা করিয়া থাকে। তাহার উপর ক্রমে ছোট ছোট গাছপালা; ক্রমে আর গাছ নাই, কেবলই পাহাড়, তাহার মধ্য দিয়া চলিতে হয়। ক্রমে একটু একটু গরম টের পাওয়া যায়। শেষে যত শিখর দেশের নিকট উঠা যায় ততই ভয়ানক। সেখানে মাঝে মাঝে এক একটা ফাটল আছে; ঐ ফাটলের ভিতর দিয়া ভিতরের জলন্ত গলা পাথর প্রভৃতি দেখা যায়, দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া যায়। আর গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। তার পর চূড়াতে পঁহুছিলে যে মনে কি হয়, সে আর কি বলা যায়? তিনি বলিতেন—'সেখানকার দৃশ্য আর কি বর্ণিব? উপরে অন্ধকার করিয়া রাশি রাশি ধূম উঠিতেছে আর সেই অত্যুচ্চ শিখরে আমি বসিয়া যখন মুখ হেঁট করিয়া গহ্বরের দিকে চাহিলাম, দেখি সে বর্ণনা করা অসম্ভব,—ভীষণ অগ্নিময় সমুদ্র যেন গর্জ্জন করিতেছে। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, বুক ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। বুঝি বা পায়ের নীচের ছাত ভাঙ্গিয়া যায়। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! সেই অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়া তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইতে হইবে।

ভয়ে নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দৃশ্যটী এমনি গম্ভীর ও মনোহর যে সে চমৎকার স্থান ছাড়িয়া আসিতেও ইচ্ছা হয় না।' আরও কত কথা যে তিনি বলিয়াছিলেন তা সব বলিতে গেলে রাত ফুরাইয়া যাইবে।"

কিশোরী—"কে তিনি, দাদা?"

নবীন বাবু—"তোমরা জান না।"

নলিন—"আমি যখন বড় হব, আমি সেই স্থানটা দেখ্‌তে যাব।"

নবীন বাবু—"হাঁ এই ত চাই। নিজে নিজে দেখে শিখ্‌বে। আমরা বুড় হয়েছি আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা খুব লেখা পড়া শিখে নানা দেশ বেড়াবে, কত কি শিক্ষা করিবে ও জ্ঞান বাড়াইয়া বড় লোক হইবে। এখন, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখের বর্ণনা কেবল শুনিয়া রাখ।"

আগ্নেয়গিরি যত পুরাতন হয়, আর যত বার তাহার অগ্ন্যুদ্গম হয় ততই তাহার আকার নূতন হইতে থাকে। ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের ঠিক এই রূপ হইয়াছে। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী চূড়া, তাহার চারিদিকে আর একটী পুরাতন চূড়ার ভাঙ্গা খানিকটা দেখা যায়, তাহার চারিদিকে আবার একটা আরও পুরাতন চূড়ার ভাঙ্গা অংশ দেখা যায়। এরূপ হওয়ার কারণ তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ। যেমন বেশী তেজ হইলে এক একটা তুব্‌ড়ী ফাটিয়া যায়, তেমনি ভিতরে আগুনের তেজ বেশী হইয়া প্রতি অগ্ন্যুদ্গমের সময়ে পুরাতন চূড়া উড়িয়া যায় ও তাহার উপর আবার গলা পাথর প্রভৃতি পড়িয়া নূতন একটা চূড়া প্রস্তুত হয়।"

অমূল্য—"আগ্নেয় পর্ব্বত ত এক রকম বুঝিলাম; উহার অগ্ন্যুদ্গম কিরূপে হয়, দাদা বাবু?"

নবীন বাবু—"ওঃ! সে বড় ভয়ানক ব্যাপার! না দেখিলে তার কিছুই জ্ঞান হয় না, কিছুই ধারণা করা যায় না। দেখাও সহজ নয়। তবে যাঁহারা প্রাণপণ করিয়াও জ্ঞান লাভের জন্য এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখিতে সুবিধা পান, তাঁহাদের বর্ণনা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পাইতে পারিবে। কোথাও কিছু নাই,—হঠাৎ হয়ত এক দিন দূরে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শোনা যায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-কম্প হইতে থাকে। তখনি লোকে বুঝিয়া লয় যে একটা ভয়ানক ব্যাপার শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। কাজেই যে যেখানে পায় সব ধন কড়ি, বন্ধু বান্ধব সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ঐ বজ্রধ্বনি ও ভূমি-কম্প আরও প্রবল হইয়া উঠে, এবং পর্ব্বতের চূড়া হইতেও ভীষণ শব্দ হইতে থাকে। শেষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘের মত রাশি রাশি বাষ্প উঠিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া ফেলে। ভলকে ভলকে তেজের সহিত বাষ্প সকল খুব দূর পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে থাকে। তাহাতে কখন কখন অবিরল বৃষ্টি পতিত হইতেও দেখা যায়। এই সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার আকারের প্রস্তর খণ্ড সমূহ প্রচণ্ড বেগে আকাশে উঠিতে থাকে। শুনা যায় যে পূর্ব্বোক্ত কটোপাক্সী পর্ব্বত হইতে ৫,৪০০ মণ ওজনের একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই (শুনিলে অবাক্ হইবে) ৯ নয় মাইল অর্থাৎ ৪৷৷০ সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িয়াছিল!! তোমরা পাঁচ সের গোলা একটা তুলিয়া দশ হাত দূরে ছুড়িয়া দিতে পার না, আর ৫,৪০০ পাঁচ হাজার চারি শত মণ ভারী একটা পাথর কি না, সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে ছুড়িয়া দিল! (সকলেই খুব আশ্চর্য্য হইয়া শিহরিয়া উঠিল।)

"এই সময়ে এত ভস্মরাশি গহ্বরের মুখ দিয়া আকাশে উঠিতে থাকে যে একেবারে সূর্য্যকে ঢাকিয়া দশদিক অন্ধকার করিয়া ফেলে। এমন কি ৭।৮ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত চারিদিকে অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকার করিয়া ঐ সকল আগ্নেয় ধূলি রাশি (ইংরাজিতে volcanic dust বা sand বলে) আকাশকে ছাইয়া ফেলে এবং কখন কখন ১০০।১৫০ ক্রোশ দূরে পর্য্যন্ত গিয়া অবিরল বৃষ্টিপাতের ন্যায় পতিত হইতে দেখা যায়। ইহা কিন্তু ধূলি বা ভস্ম কিছুই নয়। ভিতরে যে দ্রব (অর্থাৎ গলা) প্রস্তর ও ধাতু সকল রহিয়াছিল, তাহাই বেগে উপর দিকে উঠিয়া বায়ুতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ি গুঁড়ি ছাইয়ের কণার মত পড়ে, এই জন্য ইহাকে কখন ভস্ম কখন বা আগ্নেয় ধূলি বলা হয়। ইহা দ্বারা ভয়ানক অনিষ্ট হয়। সমুদ্রের ধারেই প্রায় আগ্নেয় গিরিরা থাকে, কাজেই ঐ ধূলি সব সমুদ্রে পড়িয়া এত জমা হয় যে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া যায়।

"আর তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান নেপল্‌স্ দেশীয় হার্কিউলেনীয়াম্, পম্পীয়াই ও ষ্টাবী নামক তিনটী নগর এই আগ্নেয় ধূলিরাশির মধ্যে একেবারে পুতিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।"

কিশোরী—"আমি পড়িয়াছি।"

মন্মথ—"আমিও শুনিয়াছি।"

নলিন—"আমি ত জানিনা?"

নবীন বাবু—"প্রায় দুই হাজার বছর পূর্ব্বে ভিসুভিয়স পর্ব্বত এখনকার মত ছিল না, তখন উহা শান্তভাবে ছিল, কোনও উৎপাতের চিহ্ন মাত্র ছিল না। হঠাৎ ৬৩ খ্রীষ্টাব্দে একবার ভূমিকম্প দেখা দিল, ও তার পর ১৬ বছর ক্রমাগত মাঝে মাঝে ঐ রকম ভূমিকম্পই হইত। শেষে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ বছর গত হইল) ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হয়। সেই ঘটনার সময়ে এত ভস্ম বাহির হইয়াছিল যে পর্ব্বতের চারিদিকের দেশ সমূহে প্রায় ২০ হাত উচ্চ হইয়া উহা চাপা দিয়াছিল। এই ভয়ানক ভস্ম পাতেই পূর্ব্বোক্ত তিনটি নগর একেবারে চাপা পড়িয়া বহুকালের মত পুতিয়া গিয়াছিল এবং প্রায় ১৬০০ ষোল শত বছর এই ভস্মস্তূপের ভিতরে লুকাইয়া ছিল। সেদিন তাহাদের কোন কোন স্থানের খানিক খানিক অংশ উপরের চাপ খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে।

"তাছাড়া আরও ভয়ানক কাণ্ড সকল ঘটিয়া থাকে। হঠাৎ হয়ত সমুদ্রের জল খুব খানিক দূর সরিয়া গেল, তারই পরে আবার ভীষণ বেগে পর্ব্বতের মত উচ্চ হইয়া দেশ নগর, ঘর বাড়ী,—সব ডুবাইয়া বন্যা করিয়া ফেলিল। এইরূপে নানা প্রকার ভয়াবহ উৎপাত হইয়া থাকে।"

গণেন্দ্র—"ওঃ! আমার গা কাঁপ্‌ছে, বোধ হচ্ছে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত, আর সব সৃষ্টি যেন ধ্বংস হতে বসেছে।"

নবীন বাবু—"ঠিক্ সেই রকমই বটে। আমি তোমাদের কি বা বলিলাম? বড় হয়ে যখন এ বিষয়ের ভাল বর্ণনা পড়িবে তখন ভয়ে আর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিবে এ কি কাণ্ড!! যথার্থই যেন মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। জগতে এমন ভয়ানক ব্যাপার আর কিছুই নাই। পৃথিবীর যেন স্নেহ মমতা কিছুই নাই, ঘোর নিষ্ঠুর, ঘোর উন্মত্ত, জ্ঞানশূন্য! কত যত্নে যে সব গাছ লতা গুলিকে রস দিয়ে এতদিন বাঁচাইতে ছিল ও বড় করিতে ছিল, তাদের কোথায় যে কে গেল তার সন্ধান নাই! এক একটা দুরন্ত ছেলে যেমন রাগ করে ঘর দোর, ঘটী বাটী, শ্লেট, বই,

ছবি গহনা, যা সুমুখে পায় ভেঙ্গে চুরে লণ্ড ভণ্ড করে, আর চীৎকারে বাড়ী ফাটাইতে থাকে, এ সময়ে পৃথিবী যেন সেই রকম করে। ওঃ! কি ভয়ানক! এদিকে ভূমিকম্প হচ্ছে, তাহাতে আবার বজ্রাঘাতের মত শব্দে আকাশ যেন ফেটে যাচ্ছে, সমুদ্র উথলে উঠছে, ওদিকে আকাশে ঘোর অন্ধকার, ভস্মে একেবারে আকাশ ঢেকে ফেলেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই গুলা হুড মুড ক'রে এখানে ওখানে পড়্ছে, ক্রমে ভস্মরাশি ঘর বাড়ী, গাছপালা, পথ ঘাট, জল স্থল, দেশ নগর—সব ছেয়ে ফেল্ছে, পাহাড় কোথাও পৃথিবী কাঁপাইয়া ফেটে যাচ্ছে, কোথাও ভিতরের তেজে খানিকটা উড়ে যাচ্ছে।" পশু পক্ষী কে কোথায় পড়িয়া মরিতেছে তাহার ত সন্ধান নাই, থাকিতে পারেই না—মানুষই যে কে কোথায় পলাইল, কোথায় মরিল, কি কাণ্ড কিছুরই ঠিক নাই। কেবলই অন্ধকার আর বজ্রধ্বনি আর ধ্বংস!—এইত প্রলয়।

ক্রমশঃ



সাধুদিগকে কিসে চেনা যায়?



কে বুড়ো, স্ত্রী পুরুষ, কার না ইচ্ছা করে খুব ভাল হইয়া জীবন কাটায়? ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু নানা কারণে উহা কাহারো ভিতরে বেশী, কাহারো ভিতরে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্যকাল হইতেই যাঁহারা সাধু লোকের গল্প শোনেন, সাধু লোকের কাজ সব মনোযোগ দিয়ে দেখেন, ভাল ভাল লোকের জীবন-চরিত পড়েন, সচ্চরিত্র বালক বালিকাদের সঙ্গে ফেরেন এবং পিতা মাতার অনুগত হইয়া চলেন, তাঁহাদের ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। আর যাহারা ছেলে বেলা হইতেই দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গুরুজন এবং মান্যগণ্য লোকদিগকে নিন্দা করিতে শেখে, খারাপ খারাপ বিষয় লইয়া আমোদ করিতে অভ্যাস করে এবং সব ইয়ার ছেলে গুলোর মত মোটামুটি একটু লেখাপড়া শিখিয়া সকল বিষয়ের উপরে ভাসিয়া বেড়ায়, কোনকালেই তাহাদের ভাল হইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিবে না। ভাল হইবার অর্থ টা তোমরা গোল করিও না। আমি যদি বড় হইবার কথা বলিতাম তবে গোলেরই কথা ছিল বটে, কারণ *তুমি যাঁহাকে বড় লোক বলিবে হয়ত* আমার চোখে আমি তাঁহাকে এক সাধারণ লোক বলিয়া জ্ঞান করিব। এক হাজার লোকের মধ্যে আমায় ছাড়িয়া দেও আমি তাহার মধ্য হইতে যিনি যিনি সাধু লোক আছেন তাঁহাদিগকে বাছিয়া বাহির করিতে পারিব। একবাড়ী নিমন্ত্রণে এক শত লোক একস্থানে বসিয়া আহার করিতেছেন আমি তাহার মধ্যে যিনি সাধু তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেছি।

সাধু লোকের চাল চলন কথা বার্ত্তা, মুখের হাসি এবং চোখের চাউনি, সকলই একটু ভিন্ন রকম। কতকগুলি লক্ষণ আছে যাহা সকল দেশের সকল কালের সাধুগণের মধ্যেই সমান। সাধুদের অনেক লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে যে গুলি

আমরা সাধু চরিত্র হইতে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি। পৃথিবীতে যত সাধু জন্মিয়াছেন তাঁহাদের সকলের জীবনের ভিতরে ঢুকিয়া দেখ বিশ্বাসই তাঁহাদের সকল কাজের মূল। তুমি যদি একটী কাজ করিতে ইচ্ছা কর তবে আগেই ভাবিবে একাজ করিলে তোমায় কে কি বলিবে। হয়ত যদি সেই কাজ করিলে একটু ক্লেশ সহ্য করিতে হয় কিম্বা কেহ গালি দেয় কি মারিতে আইসে তবে আর তোমার পা চলিবে না। অথবা একবার যদি সেই রকমের একটী কাজ তোমার সমবয়স্ক আর কেহ চেষ্টা করিয়া না পারিয়া থাকে তবে তোমার আশা হইবে না, নিজের উপরে বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না। বাল্যকাল হইতেই প্রত্যেক সাধুর জীবনে খুব বিশ্বাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা অনেকেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নাম শুনিয়াছ। আমাদের দেশে কুরীতি সকল যাহাতে সংশোধন হয় তাহার জন্য তিনি ১৬ বৎসর বয়সের সময় হইতেই বিশ্বাস করিয়া চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। অনেক বৎসর পরে যখন চারিদিকেই ধর্ম্মের গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, যখন শিক্ষিত লোকেরা রাজা রামমোহনের প্রচারিত মত সকল গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন পুরাতন দলের লোকেরা চারিদিক হইতে রাজাকে উৎপীড়ন করিতে ছাড়িলেন না, রাজা কত অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বিশ্বাসের সহিত নিজের ঠিকমত প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজা রামমোহন রায় তখন বলিয়াছিলেন—"আজ যাঁহারা আমাকে শত্রু ভাবিয়া অত্যাচার করিতেছেন এমন একদিন আসিবে যখন তাঁহাদেরই পুত্র পৌত্রেরা যথার্থ বান্ধব বলিয়া আমায় স্মরণ করিবে।" সেই এমন এক দিনের আগমনের উপরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি অত অত্যাচার সহ্য করিয়াও ভয়ে পেছন নাই। সত্য সত্যই সেই এমন এক দিন আসিয়াছে। এখন বুড়ো বুড়ীদের কথা দূরে থাকুক, তোমাদের ন্যায় ছেলে মেয়েরাও রামমোহন রায়ের গল্প শুনিতে কত ভাল বাসেন। এখন শিক্ষিত লোকেরা প্রতিবৎসরই সভা করিয়া রামমোহন রায়কে স্মরণ করিয়া থাকেন। এইখানেই দেখ সাধুতার লক্ষণ বিশ্বাস, এবং বিশ্বাসের পুরস্কার জয়।

সত্যের প্রতি খুব আন্তরিক শ্রদ্ধা সাধুতার আর একটী লক্ষণ। মিথ্যা কথা ত সাধুরা প্রাণ গেলেও কহিবেন না, সত্যের যেখানে অপলাপ হইতেছে অর্থাৎ খাঁটি ভাব, খাঁটি মত প্রকাশ না পাইয়া মিথ্যা ভাব, অসত্য মত প্রকাশিত হইতেছে সেখানে সাধুলোকেরা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। এই বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। তোমরা তোমাদের সখাতেই শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বিষয় শুনিয়াছ। একবার রামতনু বাবুর বন্ধু মৃত রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় রামতনু বাবু বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত ছোট লাট সাহেবের দরবারে যাইতে পারিয়াছিলেন। সেই দরবারে অনেক বড় বড় বাঙ্গালী বাবুদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। রামতনু বাবু তখন একজন সামান্য স্কুলের মাষ্টার বই ত নন? সুতরাং সেখানে রামতনু বাবুই বোধ হয় আর আর সকলের চেয়ে মান সম্ভ্রমে এবং পদমর্য্যাদায় অনেক নীচু ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা রাজা মহারাজা ও খুব বড় বড় লোক তাঁহাদের সঙ্গেই ছোট লাটের আমাদের দেশ সম্বন্ধে নানা কথা